ভলিউম ১৩

কুয়াশা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ভলিউম ১৩

কুয়াশা

৩৭, ৩৮, ৩৯

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

পাঁচিশ টাকা

ISBN 984 - 16 - 1103 - ৭

প্রকাশক ঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ আলীম আজিজ

মুদ্রাকর ঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ঃ ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রুম ঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume- 13
KUASHA SERIES: 37, 38, 39
By: Qazi Anwar Husain

সূচি

কুয়াশা ৩৭	৫—৪৪
কুয়াশা ৩৮	৪৫—৯৩
কুয়াশা ৩৯	৯৪—১৩৪

কুয়াশা ৩৭

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ১৯৭৩

এক

কালো ঘন ভারি মেঘে ঢেকে রেখেছে গোটা আকাশটাকে।

থমথম করছে চারদিক।

গ্রামের পুব প্রান্তে চিনিকলের পেটাঘণ্টায় ঢং ঢং করে দুটো বাজল।

মেঘ ডাকছে। মাঝে মাঝে মেঘের সাথে মেঘের সংঘর্ষে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে চোখ-ধাঁধানো আলোয় চারদিক আলোকিত হয়ে উঠছে। পরমুহূর্তে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে ইছাপুর গ্রামটা।

ভারি দুর্যোগপূর্ণ রাত। ঘুম আসার কথা নয় ইছাপুর বা আশপাশের গ্রামগুলোর মানুষের। সদা সর্বদা তাদের আশঙ্কা—এই বুঝি হৈ-চৈ শুরু হলো, এই বুঝি আবার কোথাও ডাকাত পড়ল।

গত মাসখানেক হলো ইছাপুর এবং আশপাশের গ্রামের মানুষের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। সুস্থসবল একটি লোকও ভাল করে ঘুমায়নি গত একমাস ধরে।

সশস্ত্র ডাকাতরা বাংলাদেশের সর্বত্র ত্রাসের সঞ্চার করেছে সত্য। কিন্তু ইছাপুর থানাধীন প্রায় পাঁচটা বড় বড় গ্রামে, একদল সুসংগঠিত ডাকাত যা করছে তার বুঝি তুলনা নেই।

প্রতি রাতেই ডাকাতি হচ্ছে। মুখোশ পরে আসে তারা। আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা করে। বাধা পেলে নির্দ্বিধায় গুলি চালায়। দশ-বিশটা লাশ ফেলে দিয়ে সর্বস্ব নিয়ে চম্পট দেয়।

ডাকাতরা নিশ্চয়ই গ্রামের লোক। তা না হলে মুখোশ পরে আসে কেন? এ প্রশ্নে প্রতিটি লোকই একমত। কিন্তু আজ অবধি একটি লোককেও গ্রামবাসীরা সন্দেহ করতে পারেনি। ধরা তো দূরের কথা।

ইছাপুর থানার জাঁদরেল ইন্সপেক্টর হায়দার সাহেব যেমন রাগী তেমনি করিৎকর্মা মানুষ। ডাকাত দলকে ধরার জন্যে আদাজল খেয়ে নেমেছেন তিনি। রাত নেই দিন নেই ডাকাতদের খোঁজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। দিনের পর রাত আসছে। রাতে ঠিকই ডাকাতি করছে ওরা। নগদ টাকা এবং স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে নিরাপদে।

এলাকার ধনীলোকেরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। কোন একটি উপায় করার জন্যে রোজই তাঁরা থানায় ধরনা দিচ্ছেন। হায়দার সাহেবের সাথে নানা পরামর্শ

করছেন তাঁরা। হায়দার সাহেব ধৈর্য ধরার উপদেশ দেন, আশ্বাস দেন। সব কথার শেষে তিনি বলেন, 'জনসাধারণের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া পুলিসবাহিনী একা পারবে না এই ডাকাত দলকে কাবু করতে। আপনারা ভয় পেলে চলবে না। সাহসে বুক বেঁধে বাধা দেবেন।'

হায়দার সাহেবের কথা শুনে সকলের মুখ শুকিয়ে যায়। কার এত বুকের পাটা যে এমন ভয়ঙ্কর একদল ডাকাতকে বাধা দিতে যাবে?

প্রথম প্রথম বাধা দেয়া হয়েছিল বৈকি। ফল হয়েছিল মর্মান্তিক। বিশটা পঁচিশটা করে লাশ পড়েছিল।

অথচ ইছাপুর থানাধীন পাঁচটা গ্রামে ডাকাতদের সুযোগ সুবিধে কম। গ্রাম আসলে নামেই, এলাকাটা প্রায় শহর বলা যায়। ইলেকট্রিসিটি তো আছেই, গ্রামের লোকজন অধিকাংশ ধনীলোক বলে বহু বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্রও আছে। বাড়ি-ঘরগুলো ছাড়া ছাড়া ভাবে নয়। ইছাপুর, চন্দ্রগ্রাম এবং ভাটপাড়া ঘনবসতি গ্রাম। কৌশলে বাধা দিলে ডাকাতদের পালাবার রাস্তা বন্ধ করে দেয়া যায়। কিন্তু ঝুঁকি নিতে রাজি নয় কেউ।

ভয় শুধু ডাকাতকেও নয়। আরও একটি অলৌকিক ভয় আছে। যার কোন ব্যাখ্যা নেই। অথচ ভয়টা অমূলকও নয়।

ঢং করে শব্দ হলো আবার একটা। পেটাঘড়িতে আড়াইটা বাজল।

চিনিকল কোম্পানীর নিজস্ব রেলপথের উপর একদল খাকি পোশাক পরা পুলিস এসে দাঁড়াল।

রেললাইনের এপারে ইছাপুর। ওপারে চন্দ্রগ্রাম। দল বেঁধে চন্দ্রগ্রামে গিয়েছিল পুলিসবাহিনী। পাঁচজনকে রেখে ফিরে আসছে ওরা ইছাপুরে।

থ্রী-নট-থ্রী রাইফেল কাঁধে নিয়ে রেললাইনের উপর থেকে ধান খেতে নামল ওরা। বাতাস বইতে শুরু করেছে এতক্ষণে।

কনস্টেবল রাখাল বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে দেখে জব্বার জিজ্ঞেস করল, 'কি দেখছ পিছনে?'

'না-না! কিছু না।'

কথাটা বলেই জোরে পা চালাল রাখাল। জমাদার সাকীর বলল, 'এবার লাইট অফ হয়ে যাবে। ঝড় আসবে, মনে হচ্ছে।'

ছোট ধান খেত। খেতের পর উঁচু জমি। লম্বা লম্বা ঘাস সেখানে। তারপর অপ্রশস্ত পাকা রাস্তা। এদিকের রাস্তার দু'পাশে ঘরবাড়ি নেই বলে লাইট পোস্টও নেই। প্রায় শ দুয়েক গজ পর পাশাপাশি অনেকগুলো বাড়ি। ওদিকে লাইটপোস্ট আছে। বাতি জ্বলছে। দেখা যাচ্ছে দূর থেকে।

'শালারা বোধহয় আজ ভাটপাড়া বা শিমূলপুরে হামলা করবে। এদিকে পরপর দুদিন ডাকাতি করেছে...।'

জমাদার সাকীরের কথায় বাধা দিয়ে রাখাল বলে উঠল, 'ওদিকে চেষ্টা করলে ব্যাটারা নির্ঘাৎ ধরা পড়বে আজকে। ইন্সপেক্টর সাহেব দলবল নিয়ে ওদিকেই আজ গেছেন না?'

'সাব ইন্সপেক্টর সাহেবও তো গেছেন মধুগ্রামে। শিমূলপুরেও যাবেন। কিন্তু...!'

জমাদার কথা শেষ না করে হতাশাব্যঞ্জক একটি অর্থহীন শব্দ করল নাক দিয়ে।

পাকা রাস্তায় উঠে হঠাৎ বেসামাল হয়ে পড়ল পুলিসবাহিনীর পাঁচজন লোক। প্রচণ্ড বাতাসে সোজা হয়ে পথ চলা যাচ্ছে না।

'বৃষ্টি আসবে!' কথাটা বের হলো হাশেমের গলা দিয়ে। জোরে পা চালাল ওরা।

'তিনটে প্রায় বাজে, না?' জিজ্ঞেস করল জব্বার।

'দূর, এই তো আড়াইটা বাজার ঘন্টা হলো...!'

কথা না বলে চুপ করে থাকতে পারছে না ওরা। অপ্রয়োজনেও কথা বলতে হচ্ছে। ওদের পাঁচজনেরই মনে একটি ভয় ঢুকে আছে। সেটাকে তাড়াতে পারছে না মন থেকে। সেই ভয় থেকে বাঁচবার জন্যেই কথা বলছে।

আলোর কাছাকাছি এসে বুকে সাহস ফিরে পেল ওরা। সাকী বলল, 'ভিজতে আজ হবেই।'

'যে রকম বাতাস দিচ্ছে তাতে মেঘ কেটে যেতেও পারে...।'

রাখালের কথা শেষ হলো না, পাঁচজন রাইফেলধারী পুলিস পাথরের মূর্তি হয়ে গেল।

ঠিক তখুনি প্রচণ্ড শব্দে গর্জন করে উঠল মেঘ। তারপরই কেঁপে উঠল পায়ের নিচের মাটি। অত্যুজ্জ্বল আলোয় ধাঁধিয়ে গেছে ওদের চোখ।

রাস্তার দুই পাশে পাশাপাশি বাড়ি। প্রায় চল্লিশ গজ দূরে একটি গলি। গলিটা ডান দিক থেকে এসে মিশেছে পাকা রাস্তায়। রাস্তা এবং গলির মাথায় একটি লাইটপোস্ট।

গলির ভিতর থেকে একটি লোক ধীর পদক্ষেপে লাইটপোস্টের নিচে এসে দাঁড়াল।

লোকটিকে দেখামাত্র সাকীর, জব্বার, রাখাল, হাশেম এবং সুলতানের শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। নিঃশব্দে মর্মরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা।

পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। লাইটপোস্টের আলো তার সর্বশরীরে। কালো রঙের প্যান্ট লোকটার পরনে। গায়ে কালো চাদর। প্রকাণ্ড পাখির ডানার মত কালো চাদরটা উড়ছে বাতাসে লোকটার দুই পাশে।

দম বন্ধ করে একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচজন।

'কে ওখানে!'

সাকীরের অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। চিৎকার করে, জোর দিয়েই প্রশ্নটা

করতে চেয়েছিল সে। কিন্তু গলা শুকিয়ে যাওয়ায় কাঁপা কাঁপা দুর্বল কণ্ঠস্বর বাতাসের শব্দের সাথে মিশে গেল। কথাটা লোকটার কানে পৌঁছুল কিনা বোঝা গেল না।

লোকটা কিন্তু পিছন ফিরে তাকাল না।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সামনে তাকিয়ে দূরে কি যেন দেখছে লোকটা।

গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল ওদের। এক সময় ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাতে শুরু করল লোকটা। আবার গর্জে উঠল মেঘ।

ঘাড় ফিরিয়ে লোকটা তাকাল।

সাদা ধবধব করছে মুখের হাড়গুলো। সারাটা মুখে একতিল মাংস নেই। নাকের গর্ত দুটো বড় বড়। সাদা দেখাচ্ছে নাকের হাড়টুকুও। দাঁতগুলো অস্বাভাবিক বড় বড়। চোখ দুটোর জায়গায় গর্ত, সেখানে অন্ধকার। ভিতরে মণি আছে কিনা বোঝা যায় না। কপালের হাড়টা চকচক করছে ইলেকট্রিক আলোতে। বড় বড় দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে 'জিনিসটা'।

হুবহু একটি নরকঙ্কালের মুখ।

কয়েকমুহূর্ত পর ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে আবার সামনের দিকে তাকাল সে। দাঁড়িয়ে রইল একইভাবে কয়েক মুহূর্ত। তারপর পা বাড়াল।

ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে 'জিনিসটা'। বহুদূর অবধি দেখা গেল তাকে। ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে এল আকৃতিটা। এক সময় আর দেখা গেল না। শ্মশানের পথে বড় মাঠের দিকে চলে গেল সেটা।

গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। প্রথমে নড়ে উঠল রাখাল।

'ভগবান! ভগবান!'

কাঁপতে কাঁপতে কার উদ্দেশ্যে যেন নমস্কার করল সে।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সাকীর বলল, 'দেখো দেখো, কেমন কাঁপছে দেখো আমার হাতটা।'

জব্বার হাশেমের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'ভয় নেই। চলে গেছে।'

হাশেমকে আশ্বাস দেবার কারণ আছে। খুব বেশি ভীতু সে। এদের পাঁচজনই এর আগে এই আশ্চর্য কঙ্কালকে দেখেছে। ভয় প্রায় সবাই পেয়েছে। কিন্তু হাশেম প্রথম দিন দেখেই জ্ঞান হারিয়ে প্যান্ট খারাপ করে ফেলেছিল।

'চলো, চন্দ্রগ্রামেই ফিরে যাই। ওখানে…।'

'হ্যাঁ। তাই চলো।'

সাকীরের সমর্থনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সবাই। আজ রাতে ইছাপুরে আর থাকা নয়। আল্লার ভরসায় ইছাপুরকে রেখে চন্দ্রগ্রামের দিকে দ্রুত পা চালাল ওরা।

দুই

থানায় বসে কথা হচ্ছিল।

পাটের ব্যবসায়ী তালুকদার সাহেব চোখ বড় বড় করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন ইন্সপেক্টর হায়দারের দিকে। তারপর সিগারেটের প্যাকেটটা চিনিকলের সাপ্লাইয়ার আশরাফ সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'বলেন কি, সাহেব! নগদ পঁচাত্তর হাজার টাকা! অত টাকা কাশেম ব্যাপারী বাড়িতে রাখল কোন্ সাহসে?'

লঞ্চ মালিক গোলাম মাওলা সাহেব গালের এক ধারের চিবানো পান জিভ দিয়ে অন্যধারে নিয়ে যেতে যেতে বিকৃত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'গহনা-টহনা কি পরিমাণ ছিল?'

সাব ইন্সপেক্টর মাথা নিচু করে বসেছিল। মুষড়ে পড়েছে সে। মাথা না তুলেই উত্তর দিল, 'পঁচিশ ভরির মত।'

'সব নিয়ে গেল?'

'হুঁ।'

ইন্সপেক্টর হায়দার সাহেব আনমনে বড় বড় গোঁফে আঙুল বুলাচ্ছিলেন। মোটা একটা চুরুট টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে বড় বড় লাল চোখ জোড়া তুলে ঘন ঘন মাথা নাড়লেন। বললেন, 'এ দুঃখ রাখব কোথায়! কাশেম সাহেবদের বাড়ি থেকে বড় জোর সিকি মাইল দূরে ছিলাম আমরা—অথচ কিছু টেরই পেলাম না! আরে সাহেব, সেকি যেমন তেমন বৃষ্টি! আর শুধু কি বৃষ্টি, মেঘের সে কি ডাক! ব্যাটারা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ডাকাতি করে গেলেও শুনতে পাবার কথা নয়।'

গতরাতে ভোরের দিকে ডাকাতি হয়েছে মধুগ্রামের কাশেম ব্যাপারীর বাড়িতে। কাশেম ব্যাপারীর এক ছেলেকে এবং একজন বৃদ্ধকে খুন করে গেছে ডাকাতরা।

সাব ইন্সপেক্টর শরীফউদ্দীন ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাল মুখ তুলে। বলল, 'তিনটে বাজার পর থেকেই কেন যেন মন খুঁত খুঁত করছিল। বারবার যেতে ইচ্ছে করছিল মধুগ্রামের দিকে। কিন্তু আপনি এখানে আছেন বলে মনকে আশ্বাস দিয়ে রাখছিলাম।'

একটু থেমে আবার সে বলল, 'কিন্তু আমরা গেলেও কি আর করতে পারতাম! কে আর জানত কাশেম ব্যাপারীর বাড়িতে ওরা হামলা করবে। আপনাদের মতই হত হয়তো, কাছাকাছি থেকেও জানতে পারতাম না…!'

তালুকদার সাহেব হাতঘড়ির সোনার চেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নগদ টাকা বাড়িতে রাখি না। কিন্তু মেয়ে-বউদের গহনা তো আর সরিয়ে রাখা যায় না।

ডাকাতের ভয়ে কি বউ-ঝিরা গহনাও পরবে না? ইন্সপেক্টর সাহেব, উপায় একটা বের করুন। এভাবে রাতের ঘুম হারাম করে ক'দিন কাটবে?'

টাইয়ের নট ঠিক করতে করতে চিনিকলের ম্যানেজার মি. আব্বাস বললেন, 'টাকা-পয়সাই বলুন আর গহনাই বলুন—প্রাণের চেয়ে বড় আর কি? আমার বাড়িতে তো ওসব কিছুই পাবে না। আর না পেলেই খেপে গিয়ে সবাইকে খুন করে যাবে। দরকার নেই, আমি ফ্যামিলি পাঠিয়ে দেব ঢাকায়।'

গোলাম মাওলা বললেন, 'আপনি না হয় ঢাকায় পাঠিয়ে দিলেন, সেখানে বাড়ি আছে আপনার। আমাদের মত লোকের, যাদের জমিজমা আছে, গ্রামে নানা দায়-দায়িত্ব আছে তাদের কি উপায়?'

ইন্সপেক্টরের দিকে তাকালেন মাওলা সাহেব। তারপর বললেন, 'মোটকথা এখন একমাত্র ভরসা হায়দার সাহেব। আমরা সবাই আছি পিছনে। টাকা পয়সা লাগে, ব্যবস্থা করব। কিন্তু এ বিপদ থেকে উদ্ধার হবার একটা উপায় করতেই হবে।'

জাঁদরেল পুলিস ইন্সপেক্টর হায়দার সাহেব গাম্ভীর্য ভেঙে হেসে ফেললেন। এক মুখ নীলচে ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন, 'টাকার কথা তুলছেন কেন? টাকা আমার নেই, কিন্তু যা মাইনে পাই সেটুকুও দিতে রাজি আছি আমি—উপায় বের করুন আপনারা। নাহয় দু'মাসের বেতন যাবে আমার। কিন্তু চাকরিটা তো থাকবে। এখন যা অবস্থা দেখছি, এরকম যদি আরও কিছুদিন চলে তাহলে নির্ঘাৎ চাকরি যাবে।'

সাব ইন্সপেক্টর হঠাৎ মুখ তুলে বলল, 'ডাকাত ধরার জন্যে রাতে আমরা যে শক্তি ব্যয় করছি তা না করে দিনের বেলা আমরা যদি কুয়াশার আস্তানা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি···!'

'তাই করো না কেন! তুমি সে চেষ্টাই করো। আমি রাতে ব্যাটাদেরকে ধরার চেষ্টা করি। কিংবা তুমি রাতে ঘুরে বেড়াও দলবল নিয়ে, আমি দিনের বেলা···।'

আশরাফ সাহেব বললেন, 'কিন্তু কুয়াশা এই এলাকায় আস্তানা গেড়েছে বলে মনে হয় না। তাই যদি হত তাহলে এতদিনেও কি তার আস্তানা কারও চোখে পড়ত না?'

সাব ইন্সপেক্টর বলল, 'কিন্তু পচাগড়ের জঙ্গলে কেউ ঢোকে আজকাল? ঢুকলে হয়তো এতদিনে নিশ্চয়ই কারও না কারও চোখে পড়ত কুয়াশার আস্তানা। ওই জঙ্গলেই আছে···।'

হায়দার সাহেব বললেন, 'ভাল কথা বলেছ। আজই, বুঝলে, জঙ্গলটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা যাক। তুমি চন্দ্রগ্রাম থেকে খাল পেরিয়ে জঙ্গলে ঢোকো। আমি এদিক থেকে ঢুকি।'

'কিন্তু সবাই তো সারারাত জেগে, বৃষ্টিতে ভিজে কাহিল হয়ে পড়েছে। সবাইকে ডেকে পাঠাতে হয়। আজ বরং থাক, আগামীকাল ভোর থেকে শুরু করা যাবে। আজ রাতে আর খামোকা টহল দিতে বের হবার দরকার নেই।'

এমন সময় বাইরে শোরগোল শোনা গেল। সবাই চুপ করে গেল তখুনি। বাইরে থেকে অধৈর্য কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে কার যেন, 'টোমরা হামাকে চিনিটে পারিটেছ না—ইডিয়েট কাঁহিকে। ইংরেজের ব্লাড বহিটেছে হামার ঢমনীটে। ওয়ানস্ আপন এ টাইম টোমরা যাডের গোলাম ছিলে। এই, এই, খবরডার, গায়ে হাট ডিয়ো না, ভাল হবে না বলে ডিচ্ছি···চলো, হামি যাচ্ছি, ডেখে লিবো টোমাডের বসকে। হামার বসের, থুড়ি, হামার ফ্রেণ্ডের নাম শুনলে টোমাডের বস্ সেন্সলেস হয়ে যাবে···!'

অফিসের দোরগোড়ায় দেখা গেল স্যানন ডি. কস্টাকে। তার পিছনে দুজন লোক। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে তাদের।

ডি. কস্টার ঢোলা প্যান্টের দু'এক জায়গায় কাদা লেগে রয়েছে। পায়ে গামবুট। কাদায় লেপা। মাথার হ্যাটটা কপাল অবধি নামানো।

ইন্সপেক্টর হায়দার সাহেব কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ডি. কস্টার দিকে। ডি. কস্টাও নিজের চোখ দুটো কখনও কুঁচকে, কখনও বড় বড় করে আবার কখনও বাঁকা করে দেখছে ইন্সপেক্টরকে।

'কোত্থেকে নিয়ে এলে এই জানোয়ারকে তোমরা, নঈম?'

গর্জন করে উঠলেন ইন্সপেক্টর। ডি. কস্টার কোন ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না।

নঈম হচ্ছে অপর লোক দুজনার একজন। আরেক জনের নাম সোবহান। সিভিল ড্রেসে রয়েছে ওরা। আসলে এই থানারই কনস্টেবল দুজন।

'পচাগড়ের আশপাশে ঘুরঘুর করছিল, স্যার। আমাদেরকে দেখে কাছে ডেকে বলে কিনা সিগারেট খাও আর পাঁচ দুই সাত হয়ে যাও!'

'হোয়াট!'

গর্জে উঠলেন আবার ইন্সপেক্টর, 'পাঁচ দুই সাত হয়ে যাও মানে?'

রোগা লিকলিকে হাড়সর্বস্ব ডি. কস্টার শরীরটা নড়ে উঠল। সোজা টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে সে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ইন্সপেক্টর হায়দার। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে একটি খালি চেয়ারে ইন্সপেক্টরের মুখোমুখি বসল সে। বসেই উঠে দাঁড়াল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করল এক প্যাকেট 'সোনার বাংলা' সিগারেট।

সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে সিলিংয়ের দিকে একমুখ কটুগন্ধী ধোঁয়া ছেড়ে আবার সে আসন গ্রহণ করল। তারপর গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল, 'হু আর ইউ? কঠা বলিবার আগে হাপনার পরিচয় হামার জানা ডরকার। হোয়াট'স্ ইওর নেম?'

সাব ইন্সপেক্টর শরীফ ডি. কস্টার পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, 'বেয়াদপি করার জায়গা পাওনি, না? ওর পরিচয় বলে দিতে হবে? ইন্সপেক্টর হায়দার চৌধুরী···। যাকগে, তুমি কে? কোথায় থাকো? জঙ্গলের ওদিকে কি করছিলে। ওদেরকে আজেবাজে কথা বলেছ কেন?'

ডি. কস্টা সিগারেটে টান দিয়ে বলল, 'হাপনার কোশ্চেনের অ্যানসার ডেয়া ইমপসিপল। বুঝিটে পারিটেছেন, মিস্টার? হামি একজন সিটিজেন অব বাংলাদেশ। বাংলাদেশ সরকারকে হেলপ্ করার জন্যে এই এরিয়ায় কাজ করিটেছি। সুটরাং...!'

'ব্যাটা বিদেশী গুপ্তচর।' ফিসফিস করে বললেন তালুকদার সাহেব আশরাফ সাহেবের কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে। 'সারাদেশে এই যে লুটপাট, হাইজ্যাক, ডাকাতি, গুম-খুন হচ্ছে তা বড় বড় বিদেশী রাষ্ট্রের চালেই তো হচ্ছে। হাজার হাজার গুপ্তচর আছে বাংলাদেশে...!'

'শরীফ!'

কঠিন কণ্ঠ ইন্সপেক্টরের, 'লোকটাকে সেলে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে রাখো।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল ডি. কস্টা। চিৎকার করে উঠল সে, 'বি কেয়ারফুল! খবরডার, মিস্টেক করিবেন না। হামি চাই না হামার বসকে ডেকে পাঠাতে, বাট, হাপনি যদি আমাকে বাধ্য করেন... ।'

কিন্তু নঈম ও সোবহান ডি. কস্টাকে পিছন থেকে ধরে ফেলল শক্ত করে।

জোর করে টেনে নিয়ে গেল ওরা ডি. কস্টাকে। ডি. কস্টা ঘন্টায় একশো মাইল বেগে ঝড়ের মত উর্দু, বাংলা এবং ইংরেজিতে গালিগালাজ চালাতে লাগল। কিন্তু কাজ হলো না কোন। সেলে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দেয়া হলো গেট।

দশ মিনিট পর ইন্সপেক্টরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল স্বয়ং কুয়াশাকে।

তখনও ডি. কস্টাকে নিয়েই আলাপ করছিল সবাই। তালুকদার সাহেব থেকে শুরু করে গোলাম মাওলা অবধি সবাই অনুমান করলেন যে ডাকাতির সাথে এই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান লোকটি নিঃসন্দেহে জড়িত। আলোচনা চলছিল, এমন সময় অফিসরুমের দোরগোড়ায় প্রকাণ্ড এক পুরুষকে দেখা গেল।

মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে রইল সে। প্রত্যেকের দিকে তাকাল একবার। আগন্তুকের সাথে চোখাচোখি হবার সাথে সাথে সবাই কেমন যেন মুগ্ধ, সম্মোহিত হয়ে পড়ল। অদ্ভুত সুন্দর চোখ। সে চোখ জোড়ার দৃষ্টি আরও অদ্ভুত। যেন বুকের ভিতর, হৃদয়ের অন্তস্তল অবধি দেখতে পায় সে তার দৃষ্টি দিয়ে। আগন্তুক যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। এমন সুগঠিত পেশিবহুল লম্বা চওড়া বাঙালী আজকাল দেখাই যায় না।

আগন্তুক পা বাড়াল। ইন্সপেক্টরের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল সে।

'বসুন।'

হাসি মুখে মুগ্ধ চোখে বিনয়ের সাথে বললেন ইন্সপেক্টর, 'বলুন আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি।'

কথাগুলো বলে উঠে দাঁড়ালেন ইন্সপেক্টর। আগের কাজ পিছিয়ে গেছে। শুধরে

নেবার প্রয়োজনে করমর্দনের জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি আগন্তুকের দিকে।

কুয়াশা ইন্সপেক্টরের বাড়িয়ে দেয়া হাতের দিকে তাকাল না। অদ্ভুত ভারি গলায় সে জানতে চাইল, 'আমার লোক স্যানন ডি. কস্টাকে আপনারা আটকে রেখেছেন কেন?'

থতমত খেয়ে ইন্সপেক্টর নিচু গলায় উচ্চারণ করলেন, 'আপনার লোক! স্যানন ডি. কস্টা!'

স্যানন ডি. কস্টার নাম শুনেছিলেন বহুদিন আগে ইন্সপেক্টর। ধীরে ধীরে তাঁর দুই চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। কুয়াশার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তিনি। কিন্তু নিজেকে সামলে নেবার অদ্ভুত শক্তি ইন্সপেক্টরের। ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল তাঁর মুখের চেহারা।

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল জাঁদরেল পুলিস ইন্সপেক্টর হায়দার চৌধুরীর চোখের দৃষ্টি। ঠোঁট জোড়া বেঁকে গেল সামান্য। ব্যঙ্গাত্মক একটু হাসি ফুটল সেই ঠোঁটে। দ্রুত কি যেন চিন্তা করছেন তিনি। কিন্তু কেউ যেন তা টের না পায় সে ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন তিনি।

'আপনিই! আপনিই তাহলে কুয়াশা!' ব্যাঙ্গাত্মক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ইন্সপেক্টর। ধীরে ধীরে তার একটি হাত এগিয়ে যাচ্ছে টেবিলের ড্রয়ারের দিকে।

কুয়াশা ইন্সপেক্টরের হাতের দিকে একবারও না তাকিয়ে বলে উঠল, 'ভয় নেই, বের করুন আপনি রিভলভার, বাধা দেব না। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।'

ড্রয়ার থেকে রিভলভার বের করে ঝট্ করে সেটা কুয়াশার কপালের দিকে তাক করে ইন্সপেক্টর কঠোর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'চালাকির জায়গা নয় এটা, মি. কুয়াশা। আমার নাম হায়দার চৌধুরী! অনেক দিনের আশা আমার আপনাকে গ্রেফতার করার। আজ কপাল খুলে গেছে...।'

প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল আচমকা কুয়াশা টেবিলের উপর।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপর বিছানো সম-আকৃতির কাচটা ভেঙে আট টুকরো হয়ে গেল। অ্যাশট্রেটা শূন্যে উঠল। শূন্যেই ডিগবাজি খেল একবার। উপুড় হয়ে পড়ল আবার টেবিলে। টুকরো সিগারেট, চুরুট, ছাই এবং নোংরা খানিকটা পানি ছড়িয়ে পড়ল কাগজ পত্রের উপর। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে কুয়াশা তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমার প্রশ্নের উত্তর চাই!'

ইন্সপেক্টর হায়দার ততধিক তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'উত্তর দিয়েছি আমি। আপনাকে এবং আপনার লোককে আমি গ্রেফতার করছি।'

'কারণ?' বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করল কুয়াশা।

হেসে ফেললেন ইন্সপেক্টর। হাসি থামিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'কারণের উল্লেখ দরকার? আপনি একজন ক্রিমিন্যাল। ডাকাতি করেছেন, খুন করেছেন...।'

'প্রমাণ?'

'প্রমাণ?'

কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ, প্রমাণ। ডাকাতি করেছি, খুন করেছি—প্রমাণ করতে পারবেন?'

ইন্সপেক্টর কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কুয়াশা ধমকে উঠল, 'বাচালতা পছন্দ করি না আমি। বেশি কথা বলার সময় আমার নেই। আমাকে গ্রেফতার করার অধিকার বা ক্ষমতা নেই আপনাদের। কথাটা বিশ্বাস না হলে আপনার ওপরআলার ওপরআলা সি.আই.ডি. অফিসার মি. সিম্পসনকে টেলিফোন করে জেনে নিন। মি. সিম্পসন নাকানি-চোবানি খেয়েছিলেন একবার আমাকে গ্রেফতার করে—ফোন করুন তাকে।'

ইন্সপেক্টর একটু থমকে গেছে।

কুয়াশা বলল, 'না জেনে না বুঝে কিছু করলে তার ফল ভাল হবে না। দেরি করবেন না, ফোন করুন।'

কি মনে করে ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করতে শুরু করলেন ইন্সপেক্টর হায়দার।

মি. সিম্পসনের সাথে কয়েক মিনিট আলাপ করার পর ইন্সপেক্টর কুয়াশার দিকে রিসিভারটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'মি. সিম্পসন কথা বলতে চান আপনার সাথে।'

কুয়াশা রিসিভার নিয়ে কানে ঠেকিয়ে মি. সিম্পসনের উদ্দেশ্যে বলল, 'কুয়াশা বলছি। অকারণে আমাকে এভাবে বিরক্ত করার পরিণাম সম্পর্কে আপনাদের অধঃস্তন কর্মচারীদেরকে সাবধান করে দেয়া আপনার উচিত ছিল, মি. সিম্পসন। আপনারা কোনদিন আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ খাড়া করতে পারবেন না। তা সত্ত্বেও কেন যে... ।'

মি. সিম্পসন অপর প্রান্ত থেকে বললেন, 'তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন, তা স্বীকার করি। কিন্তু অসম্ভব নয়, কুয়াশা। যাক, ইছাপুরে কি উদ্দেশ্যে গেছ তুমি।'

আচমকা হো হো করে দরাজ গলায় হেসে উঠল কুয়াশা। হাসি থামতে বলল, 'এসেছি বিশেষ এক উদ্দেশ্য নিয়েই। কিন্তু সেকথা তো আপনাকে বলা যাবে না। যাকগে, আপনার ইন্সপেক্টরকে কি নির্দেশ দিলেন? আমাকে গ্রেফতার করার সপক্ষে?'

'ভাবছি।' অপরপ্রান্ত থেকে বললেন মি. সিম্পসন, 'ভাবছি তোমাকে সন্দেহজনক গতিবিধির অজুহাতে গ্রেফতার করে আটকে রেখে প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করলে কেমন হয়।'

'ক্ষমতা যখন আছে তখন তার অপব্যবহার হবেই। আপনিও জানেন যে আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণের অস্তিত্ব আমি রাখি না। এর আগেও তো একবার

চেষ্টা করেছিলেন, মনে পড়ে? কি হয়েছিল সেবার? মানহানির কেস করলাম, হেরেছিলেন তো? এক কাজ করুন না, আপনি বরং আপনার বসকে ফোন করে এ ব্যাপারে পরামর্শ নিন। গতবারের ঘটনা সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে আপনার বসের।'

'সে কথা আমিও ভাবছি। ঠিক আছে, খানিকপর ফোনে জানাব সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে বসকে ফোন করে জেনে নিই আমি।'

মি. সিম্পসন ফোন ছেড়ে দিলেন।

কুয়াশা রিসিভারটা রাখল ক্রেডলের উপর। ইন্সপেক্টর হায়দারের হাতে তখনও রিভলভার। কুয়াশার কপালের দিকে ধরা সেটা। কুয়াশার পিছনেও তিনজন কনস্টেবল কখন এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের হাতে রাইফেল। কুয়াশার দিকে রাইফেল তুলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে তারা। সাব ইন্সপেক্টর শরীফও দাঁড়িয়ে আছে অফিসরূমের দরজার বাইরে। তার হাতেও রিভলভার।

অফিসরূমের কোথাও বিশিষ্ট গ্রামবাসীদের এখন আর দেখা যাচ্ছে না। তারা কখন নিঃশব্দে, পা টিপে টিপে, দম বন্ধ করে থানা থেকে পালিয়ে গেছেন। কুয়াশার পরিচয় জানার পর তাঁরা আর সাহস পাননি বসে থাকতে।

'কি বললেন মি. সিম্পসন?' গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন ইন্সপেক্টর।

'অপেক্ষা করুন। সে তার বসের পরামর্শ নিচ্ছে।'

কুয়াশা কথাটা বলে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কনস্টেবল তিনজনের দিকে। তারপর জানতে চাইল, 'মি. ডি. কস্টাকে কে এনেছে থানায়?'

'আমি আর সোহরাব...।' নঈম উত্তর দিল পিছন থেকে।

'কেন গিয়েছিলে তোমরা জঙ্গলের ভিতর?' ভারি গলায় প্রশ্ন করল কুয়াশা।

নঈম দ্রুত একবার তাকাল ইন্সপেক্টর হায়দারের দিকে। তারপর কি বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করেই রইল।

মুচকি একটু হাসল কুয়াশা। তারপর ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'ডাকাতগুলো বড় জ্বালাচ্ছে, না? ধরতে চান?'

'ধরতে চাই মানে? আপনিই তো ডাকাতদের সর্দার। আপনাকে যখন হাতের মুঠোয় পেয়েছি তখন আপনার চেলাদেরকে ধরতে বেশি সময় লাগবে না। মি. সিম্পসন নিশ্চয়ই আপনাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেবেন।'

'আবার বেশি কথা বলছেন আপনি,' কুয়াশা ভারি গলায় বলল। 'ডাকাতগুলোকে আমি ধরে দিতে পারি দু'দিনের মধ্যে, যদি আপনারা আমাকে সাহায্য করেন লোকজন দিয়ে। আমি অবশ্য একাই পারব, কিন্তু সময় লাগবে বেশি।'

'মি. সিম্পসনের ফোনই সব সমাধান করবে,' বললেন ইন্সপেক্টর। তার কথা

শেষ হওয়া মাত্র বেজে উঠল ফোনের বেল।

রিসিভার কানে ঠেকালেন ইন্সপেক্টর। আধমিনিট নিঃশব্দে শুনলেন তিনি। তারপর রিসিভারটা বাড়িয়ে দিলেন কুয়াশার দিকে।

'কুয়াশা বলছি,' কুয়াশা রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বলল।

অপরপ্রান্ত থেকে সিম্পসনের গলা ভেসে এল, 'তোমারই জয় হলো, কুয়াশা। বস্ বললেন, প্রমাণ থাকলে কুয়াশাকে গ্রেফতার করো, না থাকলে ওকে ঘাঁটিয়ো না। সুতরাং…।'

'আবার কথা হবে। বিদায় নিই।'

কথাগুলো বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখল কুয়াশা। ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'আমার প্রস্তাব কি গ্রহণ করবেন এবার?'

'না। আপনাকে মি. সিম্পসনের নির্দেশে ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি ঠিক, কিন্তু আমরা নিঃসন্দেহে জানি যে আপনি এবং আপনার দলবলই এই এলাকায় প্রতি রাতে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছেন, আপনিই প্রায় শ' দেড়েক মানুষকে গত এক মাসে খুন করেছেন…।'

'পাগল আর কাকে বলে। আমার লোককে নিয়ে আসুন।'

বিরক্ত হয়ে কথাটা বলল কুয়াশা। সাব ইন্সপেক্টর চলে গেল ভিতর দিকে। খানিকপরই দেখা গেল ডি. কস্টাকে। অফিসরুমে ঢুকেই ডি. কস্টা বলে উঠল, 'বস্, ইন্সপেক্টরকে হাইজ্যাক করব নাকি?'

'আজকের মত ছেড়ে দিন বেচারীকে! চলুন।'

কথাটা বলে হো হো করে হাসতে হাসতে অফিসরুম থেকে বেরিয়ে গেল কুয়াশা। ডি. কস্টা বুক টান করে চলল তার পিছন পিছন।

সাব ইন্সপেক্টর শরীফ আপন মনেই বলে উঠল, 'কিন্তু কুয়াশা খবর পেল কিভাবে।'

উত্তর দিল একজন কনস্টেবল। সে ডি. কস্টার পিছু পিছু অফিসরুমের দরজা অবধি এসে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, 'স্যার, লোকটা একটা সিগারেটের প্যাকেট চোখের সামনে ধরে বিড়বিড় করে কি যেন বলছিল। আমি ভাবলাম ব্যাটা পাগল। আসলে ওটা সিগারেট প্যাকেট ছিল না। ওটা নিশ্চয়ই ওয়্যারলেস। মিনি সাইজের, তাই না, স্যার?'

শরীফ শুধু বলল, 'হুঁ।'

ইন্সপেক্টর ওদের কথায় কান দিচ্ছেন না। উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছেন তিনি হাত দুটো পিছনে বেঁধে।

তিন

পরবর্তী রাতেও আকাশে মেঘ করল।

ঢং করে চিনিকলের পেটাঘড়িতে রাত একটা বাজার পরই গর্জে উঠল কয়েকটা থ্রী-নট থ্রী রাইফেল।

গুলির শব্দ হলো কিন্তু কোথাও কোন শোরগোলের শব্দ শোনা গেল না। সাব ইন্সপেক্টর শরীফ উদ্দীন আজ টহল দিতে বের হয়নি। অধিকাংশ কনস্টেবলই আজ বিশ্রাম নিচ্ছে। আগামীকাল ভোরে পচাগড়ের জঙ্গলে প্রবেশ করবে তারা কুয়াশার আস্তানা খুঁজে বের করার জন্যে।

ইন্সপেক্টর হায়দারের মন কিন্তু মানেনি। তার বিশ্বাস কুয়াশা আজ রাতেই ইছাপুরে ডাকাতি করার চেষ্টা করবে। সুতরাং তাকে হাতে নাতে ধরার চেষ্টা না করলেই নয়।

দুজন কনস্টেবলকে নিয়ে টহল দিতে বেরিয়েছেন ইন্সপেক্টর। ফাঁকা গুলি করছে তাঁর সঙ্গের কনস্টেবলরাই। ডাকাতদলকে সাবধান করে দেয়াই ফাঁকা গুলি করার উদ্দেশ্য।

প্রায় ভাটপাড়ার কাছাকাছি গিয়ে ইন্সপেক্টর হায়দার তাঁর কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'চলো, এবার ফেরা যাক।'

এদিকে চন্দ্রগ্রামের দিক থেকে একটি ছায়ামূর্তি লম্বা লম্বা পা ফেলে ইছাপুরে প্রবেশ করল রাত দেড়টার দিকে। রেল লাইনের উপর দাঁড়িয়ে লম্বা ছায়ামূর্তি চারদিক ভাল করে দেখে নিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। কালো পোশাকে ঢাকা ছায়ামূর্তির দেহ। ছোট ধান খেতের উপর দিয়ে পাকা রাস্তার দিকে দ্রুত হেঁটে চলল সে।

পাকা রাস্তার উপর উঠে ছায়ামূর্তি আবার একবার দাঁড়াল। গভীর মনোযোগের সাথে কি যেন শোনার চেষ্টা করল সে। তারপর আকাশের দিকে চোখ তুলে কি যেন দেখল। বৃষ্টি না-ও আসতে পারে। জোর বাতাস বইছে। এমন সময় ডানা ঝাপটাবার শব্দ শোনা গেল ছায়ামূর্তির মাথার উপর। একটি প্রকাণ্ড বাদুড় উড়ে গেল চন্দ্রগ্রামের দিকে।

দূরে দেখা যাচ্ছে লাইটপোস্টগুলো। ওদিকে রাস্তার দু'ধারে পাকা বাড়ি। দোতলা, তিনতলা।

প্রতিটি বাড়ির গেট বন্ধ। জানালা দরজা ভিতর থেকে আটকানো। প্রতিটি বাড়ি নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। কোন বাড়ির কোথাও কোন শব্দ নেই। প্রাণহীন নিঃসাড়। প্রতিটি বাড়িই যেন এক একটি পোড়োবাড়ি। ভূতের আড্ডা।

পাকা রাস্তাটা সোজা চলে গেছে বহুদূর অবধি। বড় একটি মাঠে গিয়ে মিশেছে রাস্তাটা। মাঠের বাঁ দিকে পচাগড় জঙ্গল। সোজাসুজি গেলে পড়বে শ্মশান। শ্মশানের পাশ দিয়ে পায়ে চলা পথ। পথের শেষে হাট। তারপর আবার বাড়িঘর। ওদিকেই হাইস্কুল, খেলার মাঠ, পোস্ট-অফিস, ডাক্তারখানা ইত্যাদি।

দীর্ঘকায় ছায়ামূর্তি লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত এগিয়ে আসছে। লাইটপোস্টের আলোয় তালগাছের মত লম্বা ছায়া পড়ছে তার। আশপাশের কোন বাড়ি থেকে

অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা যায় কি যায় না। ছায়ামূর্তি নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে একতলা একটি বাড়ির দিকে তাকাল সে। সজাগ হয়ে উঠল তার শ্রবণেন্দ্রিয়। পাকা রাস্তা ছেড়ে ঘাস ভর্তি মাটিতে পা রাখল সে। তারপর নিচু বারান্দার উপর উঠে পড়ল। বারান্দার দুই দিকে দুটি দরজা। দরজা দুটি ভিতর থেকে বন্ধ। কপাটের কাঠখণ্ডগুলো যেখানে সংযুক্ত হয়েছে সেখানে অতি সরু সরু ফাঁক দেখা যাচ্ছে। সেই ফাঁক দিয়ে কোন আলোর আভাস বাইরে আসেনি।

নিঃশব্দ পায়ে একটি দরজার ভিতর থেকে একটি নারী কণ্ঠ ভেসে এল, 'আমার কি মনে হয়, জানো?'

'কি?'

দ্বিতীয় কণ্ঠটি একজন পুরুষের।

'বলব? কিন্তু ভয় করছে যে!'

নারী কণ্ঠ ফিসফিস করে বলে উঠল।

পুরুষ কণ্ঠও ততধিক ফিসফিস করে বলল, 'ভয় কি আমি তো রয়েছি।'

আমার মনে হয় মানুষ মরে গেলে ভূত হয়, আর ভূতরা নানা জায়গা থেকে আসে একই জায়গায়। যেখানে তারা···।

মেঘের গর্জনে নারী কণ্ঠ চুপ করে গেল।

'সেখানে তারা কি করে?'

'সেখানে তারা ভগবানকে ডাকে সবাই মিলে।'

'কিন্তু মানুষ মরে গেলে ভূত হয় একথা কে বলল তোমাকে?'

'ভাল মানুষরা হয় না, খারাপ মানুষরা হয়। আমি শুনেছি।'

'আচ্ছা, সে যাক। কি বলতে চাইছিলে তাই বলো।'

'আমরা যে কঙ্কালটাকে দেখছি প্রতিদিন সে-ও ওই উদ্দেশ্যে শ্মশানে যায়।'

'কিন্তু এত শশ্মান থাকতে ইছাপুরের শ্মশানে···।'

'কেন, ইছাপুরের শ্মশানই তো এই এলাকার সবচেয়ে বড় শ্মশান। পঁচিশ মাইলের মধ্যে আর কোন শ্মশানই তো নেই।'

'তুমি বলতে চাও পঁচিশ মাইল দূর থেকে ভূতটা রোজ আসে আমাদের গ্রামের শ্মশানে।'

'ওদের পক্ষে সবই সম্ভব। কিন্তু আসে—এ তো আর মিথ্যে নয়! রোজই তো দেখো। আজও তো দেখলে।'

'হুঁ।'

দরজার সামনে থেকে সরে এল এবার ছায়ামূর্তি। পাকা রাস্তায় নেমে আবার সে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল।

খানিক পরই দু'পাশে বাড়িঘরকে পিছনে ফেলে পাকা রাস্তা শেষ করে মাঠে

নামল ছায়ামূর্তি। ক্রমশ অন্ধকার তাকে গ্রাস করল।

অন্ধকারের মধ্যেই দ্রুত এগিয়ে চলল ছায়ামূর্তি। মাঠের মাঝামাঝি পৌঁছুল। এমন সময় শোনা গেল 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

একসঙ্গে বহু লোক বহু শিশু, বহু নারী আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল দূরে।

মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল ছায়ামূর্তি। কি যেন ভাবল সে। তারপরই শোরগোল লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করল সে ঝড়ের বেগে।

মাঠটা বিরাট। মাঠের জমি সমানও নয়। ছুটতে ছুটতে মাঠ অতিক্রম করে ছায়ামূর্তি পায়ে-হাঁটা সরু পথের উপরে চলে এল।

সময় বয়ে চলেছে হু-হু করে। চিৎকার শোনা যাচ্ছে না এখন আর। তার বদলে শোনা যাচ্ছে স্টেনগানের শব্দ।

আরও খানিক পর শ্মশানের কাছে পৌঁছুল ছায়ামূর্তি। চারদিক নীরব হয়ে গেছে আবার। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। হঠাৎ কি মনে করে শ্মশানের পাশেই দাঁড়িয়ে পড়ল ছায়ামূর্তি।

সামনে, পিছনে, ডানে-বাঁয়ে, চারদিকে অন্ধকার। কিন্তু সেই অন্ধকারেও ছায়ামূর্তি তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে। কান দুটো সদা সতর্ক তার। কি যেন শোনার চেষ্টা করছে সে। কয়েক মুহূর্ত পরই ছায়ামূর্তির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল অন্ধকারে। শুনতে পেয়েছে সে যা আশা করছিল। একজন লোক ছুটে আসছে সামনের দিক থেকে। পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে তার ছুটন্ত পদশব্দ।

ধীরে ধীরে ছায়ামূর্তি সরু পথ ছেড়ে সরে গেল এক পাশে।

চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দু'হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। একটি গাছের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ছায়ামূর্তি। তারপর কি মনে করে গাছের আড়ালে আত্মগোপন করল সে।

ছুটন্ত পদশব্দ কাছে এসে পড়েছে। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে গাছের আড়ালে ছায়ামূর্তি।

ছুটতে ছুটতে লোকটা ছায়ামূর্তিকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

খানিক পর ছায়ামূর্তি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটন্ত লোকটাকে অনুসরণ করল।

দ্রুত লম্বা লম্বা পা ফেলে আবার প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখানে এসে পড়ল ছায়ামূর্তি। মাঠের পর পাকা রাস্তা। সেখানকার লাইটপোস্টের আলোয় দেখতে পেল পাকা রাস্তার উপর উঠে গেছে লোকটা।

লোকটার পরনে কালো প্যান্ট। কালো চাদর জড়ানো তার গায়ে। বাতাসে কালো চাদরটা উড়ছে প্রকাণ্ড পাখির ডানার মত দুইপাশে। লোকটা এখন আর দৌড়াচ্ছে না। দ্রুত পায়ে হাঁটছে সে। হঠাৎ একটি লাইটপোস্টের নিচে পৌঁছে লোকটি পিছন দিকে ফিরে তাকাল।

ছায়ামূর্তি দেখল লোকটার মুখে এক তিল মাংস নেই। চোখ দুটোর জায়গায় বড় বড় গর্ত, মণি আছে কিনা বোঝা যায় না।

পিছন দিকে তাকিয়ে ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেল না 'জিনিসটা'। আবার সে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল।

ছায়ামূর্তি সতর্ক, সন্তর্পণে অনুসরণ করে চলল অদ্ভুত 'জিনিসটাকে'।

পরদিন সকাল বারোটায় দেখা গেল ইছাপুর থানায় মি. সিম্পসনকে।

'স্যার, কাজটা কিন্তু আমাদের উচিত হয়নি। কুয়াশার মত একজন কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেফতার করার জন্যে প্রমাণের অভাব যদি হয়...।'

ইন্সপেক্টর হায়দার কথাটা শেষ করলেন না।

মি. সিম্পসন গাম্ভীর্য নিয়েই এসেছেন ঢাকা থেকে। কথা বলার সময়ও সে গাম্ভীর্য তিনি ভাঙলেন না, 'কুয়াশা যদি সাধারণ একজন ডাকাত হত তাহলে কথা ছিল না, ইন্সপেক্টর। কুয়াশা বুদ্ধিমান। আপনার চেয়ে, আমাদের সবার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান সে। আইনের মারপ্যাঁচ আমাদের চেয়ে সে অনেক বেশি বোঝে। বিনা প্রমাণে তার বিরুদ্ধে আমরা যদি কিছু করি তাহলে এমন প্রতিশোধ সে নেবে যে তখন আর বাইরে মুখ দেখানো দায় হয়ে পড়বে। সুতরাং বুঝেশুনেই কাজ করা দরকার আমাদের।'

একটু থেমে মি. সিম্পসন চুরুট ধরালেন। তারপর আবার বললেন, 'আপনি বলছেন প্রমাণ সংগ্রহ করা সহজ? বেশ, করুন প্রমাণ সংগ্রহ। একটার পর একটা ডাকাতি করে যাচ্ছে সে—ধরুন তাকে হাতে নাতে।'

ইন্সপেক্টর জোর দিয়ে বললেন, 'কুয়াশাকে আমি গ্রেফতার করবই, স্যার। ছাড়বার পাত্র আমি নই। জান যায় যাবে কিন্তু ওকে আমি দেখে নেব।'

মি. সিম্পসন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন ইন্সপেক্টরের দিকে। হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এদিকের প্রতিটি ডাকাতি কুয়াশা করছে এই আপনার ধারণা, ইন্সপেক্টর?'

'অফকোর্স, স্যার।'

'আপনার এ ধারণার কারণ?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠ মি. সিম্পসনের।

থতমত খেয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলেন তিনি অপূর্ব মানসিক ক্ষমতাবলে। বললেন, 'কুয়াশাকে যেদিন থেকে দেখা গেছে এই এলাকায় সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে ডাকাতি। তাছাড়া কুয়াশা ছাড়া আর কে এমন ভয়ঙ্করভাবে ডাকাতি করতে পারে, স্যার? কুয়াশা ছাড়া আর কার এত সাহস আছে?'

'গতকাল যে ডাকাতি হয়েছে সেটাও কুয়াশা করেছে বলে আপনার ধারণা?'

'অফকোর্স, স্যার।'

মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। প্রতিটি

ডাকাতি করার সময় ডাকাতরা বাঘের মুখোশ পরে এসেছে। কুয়াশা তো এর আগে এমন ছেলেমানুষি কাণ্ড করেনি। ভীতু সে নয়, আত্মপরিচয় গোপন করে কোন কাজ করা তার স্বভাব নয়। কুয়াশার ব্যাপারে আমি একজন বিশেষজ্ঞ, ইন্সপেক্টর। আজ কত বছর ধরে তাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করছি তা জানেন?'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'কুয়াশার হয়তো এটা একটা নতুন কৌশল, স্যার। অন্তত আমার বিশ্বাস তাই। মুখোশ সে ব্যবহার করত না বলেই আজকাল করছে—যাতে তার ওপর কারও সন্দেহ না হয়।'

মি. সিম্পসন প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, 'কাল যে ডাকাতি হয়ে গেছে তালুকদার সাহেবদের বাড়িতে তাতে নিহত হয়েছে ক'জন?'

'পাঁচজন, স্যার। তালুকদার সাহেব, তার দুই ছেলে এবং দুজন চাকর।'

'অসম্ভব!' মি. সিম্পসন প্রায় চিৎকার করে উঠলেন।

'কি অসম্ভব, স্যার?' ইন্সপেক্টর অবাক হয়ে জানতে চাইলেন।

মি. সিম্পসন বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'আপনার সন্দেহ মিথ্যে, ইন্সপেক্টর। কুয়াশা অকারণে, অপ্রয়োজনে মানুষ খুন করে না।'

ইন্সপেক্টর হায়দার অসহায়ভাবে বললেন, 'কেন যে স্যার আপনারা একজন নিকৃষ্ট শ্রেণীর ক্রিমিন্যাল সম্পর্কে এত বেশি উঁচু ধারণা পোষন করেন তা আমি জানি না। কিন্তু আমি চেষ্টা করব তার নিকৃষ্ট, হীন স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার। সম্ভবত তখনই কেবল আপনাদের ভুল ধারণা ভাঙবে কুয়াশা সম্পর্কে।'

মি. সিম্পসন মনে মনে হাসলেন শুধু। ইন্সপেক্টরের কথার উত্তরে কোন মন্তব্য করলেন না। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'নরকঙ্কাল সম্পর্কে যে গুজব রটেছে সে সম্পর্কে তদন্তের রিপোর্ট কি আপনার? নিশ্চয়ই 'ভূত আছে' একথা লিখে রাখেননি রিপোর্টে?'

শুকিয়ে গেল ইন্সপেক্টরের মুখ। ধীরে ধীরে তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল ভয়।

মি. সিম্পসন তাকালেন সাব-ইন্সপেক্টরের দিকে। শরীফেরও চোখ-মুখে ফুটে উঠেছে আতঙ্ক।

সকৌতুকে তাকালেন মি. সিম্পসন এবার দণ্ডায়মান কয়েকজন কনস্টেবলের দিকে। তারাও ঢোক গিলছে ঘন ঘন।

ইন্সপেক্টরের দিকে তাকালেন মি. সিম্পসন। বললেন, 'চুপ করে থাকার অর্থ কি?'

'আপনি দেখতে চান?' গম্ভীর গলায় পাল্টা প্রশ্ন করলেন ইন্সপেক্টর।

'আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না ওটা,' স্পষ্ট ভাষায় বিরক্তি প্রকাশ করলেন মি. সিম্পসন।

'আপনি যেটাকে গুজব বলছেন সেটা গুজব নয়। এর বেশি বলবার আপাতত নেই আমার কিছু,' ইন্সপেক্টর খানিকটা আহত কণ্ঠেই বললেন।

'গুজব নয় কেন?' নাছোড়বান্দার মত প্রশ্ন করেন মি. সিম্পসন।

'নিজেদের চোখে যা দেখেছি···।'

মি. সিম্পসন বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'কি দেখেছেন নিজের চোখে?'

'নরকঙ্কালকে হাঁটতে দেখেছি।'

'নরকঙ্কালকে হাঁটতে দেখেছেন? কঙ্কাল হাঁটতে পারে বলে মনে করেন?'

'মনে করার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, স্যার। যা দেখেছি তাই বলছি। শুধু দেখিনি, গুলিও করেছি। সে গুলি "তার" গায়েও লেগেছে। কিন্তু আহত বা নিহত কিছুই হয়নি "সে"। দিব্যি হেঁটে চলে গেছে।'

'গুলি লেগেছিল? স্থির বিশ্বাস আপনার?'

'আমি একা গুলি করিনি, স্যার। সোহরাবও রাইফেল চালিয়েছিল। জিজ্ঞেস করে দেখুন ওকে।'

মি. সিম্পসন তাকালেন সোহরাবের দিকে। সোহরাব সাথে সাথে বলে উঠল, 'জ্বী, স্যার। গুলি লেগেছিল। কিন্তু কিছুই হয়নি "তার"।'

'ননসেন্স!'

সশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মি. সিম্পসন। বললেন, 'ঠিক আছে। আমি দেখতে চাই একবার তোমাদের চলমান কঙ্কালকে।'

চার

সেদিন বিকেল থেকেই বৃষ্টি শুরু হলো। সন্ধ্যার পর বেগ একটু কমল বটে। কিন্তু রাত দশটার পর প্রবল ভাবে শুরু হলো আবার। এরকম ভারী বৃষ্টি বড় একটা হয় না। ঝরছে তো ঝরছেই। বৃষ্টির শব্দে কান পাতা দায়। ঝিরি ঝিরি হলেও কথা ছিল। এ একেবারে মুষলধারে বৃষ্টি। বড় বড় ফোঁটা সবেগে নেমে আসছে মাটির দিকে। বিরতি নেই, বিশ্রাম নেই, থামবার কোন লক্ষণ নেই।

রাত বারোটা বাজার ঘণ্টা ঠিকই পড়ল চিনিকলে। ঘণ্টার শব্দ কারও কানে গেল না। কিন্তু একজন লোক ঠিকই শুনতে পেল।

ঠিক বারোটার সময় চিনিকল কোম্পানীর নিজস্ব রেলপথের উপর উঠে এল একজন লোক। লঞ্চঘাট থেকে চন্দ্রগ্রাম পেরিয়ে আসতে তার সময় লাগল প্রায় দেড় ঘণ্টা। বারোটার ঘণ্টা পড়ার শব্দ শুনে রীতিমত শিউরে উঠল জাফর নানা বিপদের কথা ভেবে।

গ্রামে বড় একটা আসে না জাফর। ঢাকার একটি চটকলের শ্রমিক সে। ছুটিছাটা এমনিতেই কম। ছুটির সময়ও সে বড় একটা গ্রামে ফেরে না। ছুটির দিনগুলোয় বরং বেশি পরিশ্রম করে সে। খেটেখুটে কিছু পয়সা না জমালেই নয়। পৃথিবীতে একমাত্র মা ছাড়া তার কেউ নেই। বিয়ের বয়েস হয়েছে তার. মা বউ না

দেখে মরবে না। জাফর তার একমাত্র ছেলে। কিছুতেই সে কালো মেয়েকে বউ করে আনবে না। সুন্দরী মেয়ে পেতে হলে টাকা চাই। তাই খাটতে হয় জাফরকে। ছুটির দিনে সে বিড়ি-সিগারেটের দোকানটা খুলে বসে। তাতে বেশ দু'পয়সা আয় হয়।

আজ শনিবার। শনিবারে মিলের কাজ কামাই করা মানে রবিবারের ছুটি হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া। তাই মায়ের গুরুতর অসুখের খবর পেয়েও জাফর আজ সারা দিন মিলে কাজ করেছে। মিল থেকে ছুটি পেয়েছে সে বিকেল পাঁচটায়। ছুটি পেয়েই ছুটে চলে এসেছে সে সদরঘাটে। লঞ্চে চেপে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল সে। চন্দ্রগ্রামের মাথায় লঞ্চ ভিড়বার কথা রাত ন'টায়। কিন্তু বৃষ্টির দরুন দেরি হয়ে গেল। লঞ্চ চন্দ্রগ্রামে ভিড়ল রাত সাড়ে দশটায়।

লঞ্চ থেকে নেমেই নানা দুর্ভাবনায় পড়ল জাফর। গ্রামের যে ছেলেটি তাকে খবর দিয়েছিল সে হাজারবার বলে দিয়েছে দিনের আলো থাকতে থাকতে গ্রামে ঢুকতে। তা না হলে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে। একে ডাকাত তার উপর নরকঙ্কালের ভয়।

চন্দ্রগ্রামে জাফরদের কোন চেনাজানা লোক নেই। থাকলে এত বড় ঝুঁকি নিত না জাফর। কিন্তু লঞ্চ থেকে নেমেই ও মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে চন্দ্রগ্রামেই কোন বাড়ির বারান্দায় বসে রাতটা কাটিয়ে দেবে।

কিন্তু খানিক পরই জাফরের মনে পড়ে যায় নরকঙ্কালের কথাটা। নরকঙ্কাল তো শুধু ইছাপুর গ্রামেই দেখা যায় না, দেখা যায় আশপাশের সব ক'টি গ্রামেই। সেক্ষেত্রে বাইরে একা রাত কাটানো যায় কিভাবে এই তুমুল বৃষ্টির রাতে?

শেষ অবধি চন্দ্রগ্রামের একটি অপরিচিত বাড়ির দরজার কড়া নেড়ে বসল জাফর। দরজা খুলবে না বাড়ির লোক তেমন আশঙ্কা তার মনে উঁকি মারেনি একবারও। কিন্তু ঝাড়া দশমিনিট চেষ্টা করার পরও যখন বাড়ির ভিতর থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না তখন জাফর মনে মনে ঘাবড়ে গেল ভীষণ।

আশ্রয় দেবার মত কেউ নেই একথা মর্মে মর্মে টের পেল জাফর। এদিকে রাত বাড়ছে। বৃষ্টির তেজও যেন বাড়ছে সেই সাথে। হঠাৎ কার উপর কে জানে প্রচণ্ড অভিমানে কান্না পেল জাফরের। চোখের জল ধুয়ে গেল বৃষ্টির পানিতে। জাফর পা ফেলল জোরে জোরে। যা আছে কপালে, বাড়ির দিকেই রওনা হবে সে।

চিনিকল কোম্পানীর রেল পথের উপর দাঁড়িয়ে ইছাপুর গ্রামটা দেখল জাফর। কোথাও কোন মানুষ নেই। প্রচণ্ড বৃষ্টির শব্দ চারদিকে। ছোট ধান খেতটা দ্রুত অতিক্রম করতে করতে জাফরের গা ছমছম করতে লাগল কেন যেন। বারবার এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সে। কিন্তু পিছন দিকে তাকাতে ভয় হচ্ছে। থেকে থেকেই মনে হচ্ছে কে যেন আসছে তার পিছন পিছন।

বৃষ্টিতে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে জাফরের শার্ট আর লুঙ্গি। লুঙ্গিটা সে তুলে

নিয়েছে হাঁটুর উপর। বৃষ্টির দাপটে চোখ মেলে রাখা দায়। তবু থামছে না জাফর। মনের ভয় জোর করে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে ছুটছে সে।

খেত পেরিয়ে পাকা রাস্তায় উঠতেই জাফরের মনে পড়ে গেল পাকা রাস্তাটা শেষ হলেই পড়বে অন্ধকার মাঠ। তারপর শ্মশান।

শ্মশানের পাশ দিয়েই যেতে হবে মনে পড়ে যাওয়ায় ভয়ে হাত-পা অবশ হয়ে এল জাফরের। চলার বেগ একটু কমল তার। ইচ্ছা হলো গলা ছেড়ে চিৎকার করে সে। কিন্তু চিৎকার করে কোন লাভ নেই জেনে জাফর নিজেকে সাহস দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

পাকা রাস্তাটার দু'পাশে দোতলা তিনতলা বাড়িগুলোর দিকে তাকাতে হাঁটার গতি আরও যেন কমে এল জাফরের। থেকে থেকে দুর্দান্ত হয়ে উঠছে একটা ইচ্ছা। একটা বাড়ির দরজায় ঘা মেরে দেখলে কেমন হয়?

সামনে একটা সরু গলি। গলিটা পাকা রাস্তায় এসে মিলেছে। গলি এবং রাস্তার মাথায় একটি লাইটপোস্ট। জাফর ঠিক করল গলির পাশের বাড়ির পরের বাড়িটার দরজায় ঘা মারবে সে। বাড়িটা চৌধুরী সাহেবদের। জাফরের বাবা বেঁচে থাকতে চৌধুরী সাহেবদের ফাই-ফরমাশ খাটত।

কিন্তু জাফর গলির কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই গলির ভিতর থেকে লম্বা একটা লোক আচমকা বেরিয়ে এল।

জাফরকে দেখতে পায়নি লোকটা। গলি থেকে বেরিয়েই লোকটি লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়াল। কিন্তু সে মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে। পিছন দিকে একবারও না তাকিয়ে সোজা হাঁটতে লাগল সে।

মুষলধারে বৃষ্টিতে ভিজে জবজবে হয়ে উঠলে কি হবে, আতঙ্কে সারা শরীরের লোম খাড়া হয়ে উঠল জাফরের। দাঁড়িয়ে পড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করল সে। কিন্তু পারল না।

হঠাৎ জাফর অনুভব করল তার নিজের ইচ্ছা শক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। দাঁড়াতে চাইলেও সে দাঁড়াতে পারছে না। কাঁদতে চাইলেও সে কাঁদতে পারছে না। চিৎকার করে উঠতে চাইলেও তার গলা দিয়ে এতটুকু শব্দ বের হচ্ছে না।

সম্মুখবর্তী লম্বা লোকটির পরনে কালো একটি রেনকোট। মাথায় একটি হ্যাট। লোকটার কোন তাড়াহুড়ো নেই। এমন তুমুল বৃষ্টির মধ্যেও স্বাভাবিক পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে সে।

রেনকোট পরিহিত যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে জাফরকে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। শত চেষ্টা করেও লোকটার আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না সে।

পাকা রাস্তার প্রায় শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে রেনকোট পরিহিত লোকটা। তার সামনেই একটি লাইটপোস্ট। শেষ লাইটপোস্ট ওটাই। জাফর লোকটার পদশব্দ শুনতে পাচ্ছে পরিষ্কার। মাত্র পাঁচ ছয় গজ পিছনে সে লোকটার। অথচ মনে

একবারও কথাটা খেলল না যে তার মত লোকটাও জাফরের পদশব্দ শুনতে পাচ্ছে।

লাইট পোস্টের ঠিক নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। পরমুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে দ্রুত পিছন দিকে তাকাল সে।

দাঁত বের করে হাসছে প্রকাণ্ড একটি নরকঙ্কালের মুখ। সারাটা মুখে মাংস নেই একবিন্দু। ধীরে ধীরে নরকঙ্কালের একটি হাত উপর পানে উঠছে। রেনকোটে ঢাকা তার হাত। হাত নেড়ে ডাকছে 'সে' জাফরকে।

হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে জাফর। গলা দিয়ে অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ বেরিয়ে আসছে তার। নরকঙ্কালকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

পাগলের মত মাথা নাড়ছে জাফর ঘন ঘন। দুই হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা করছে সে নিজেকে। কিন্তু বড় দুর্বল সে হাত দুটো। শিশুর হাতের মতই শক্তিহীন। আতঙ্কে বিকৃত দেখাচ্ছে জাফরের মুখটা। দু'পায়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, কিন্তু একে ঠিক দাঁড়িয়ে থাকাও বলে না। হাঁটু দুটো বেশ খানিকটা ভাঁজ হয়ে গেছে। কাঁপতে কাঁপতে বোধহয় বসেই পড়ত, জাফর কিন্তু সে সময় ও পেল না।

নরকঙ্কাল সামনে এসে দাঁড়াল। দুই হাত দিয়ে 'সে' ধরল জাফরের গলাটা।

'নৃনা…!'

বিকৃত উচ্চারণের ফলে সঠিক বোঝা গেল না জাফর কি বলল। সম্ভবত না শব্দটা উচ্চারণ করতে চাইল সে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার গলা দিয়ে শব্দ বের হবার সম্ভাবনা আর রইল না। নরকঙ্কাল তার গলা চেপে ধরেছে প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে।

চারদিকে তুমুল বর্ষণের শব্দ। কোথাও আর কোন শব্দ নেই। এমন সময় ঝড়ের মত এগিয়ে এল কি যেন। সবেগে ঝড়টা এসে পড়ল নরকঙ্কালের উপর।

ছিটকে পড়ে গেল জাফর দূরে। পড়িমরি করে উঠে দাঁড়িয়েই সে দেখল দীর্ঘকায় এক লোকের সাথে প্রচণ্ড মারামারি বেধে গেছে নরকঙ্কালের।

দীর্ঘকায় লোকটা কোথা থেকে আশীর্বাদ স্বরূপ এল তা বুঝতে পারল না জাফর। বুঝতে পারত যদি ভুল করেও একবার পিছন ফিরে তাকাত।

দীর্ঘকায় লোকটি নরকঙ্কালকে অনুসরণ করেই আসছিল। গলি থেকে নরকঙ্কাল পাকা রাস্তায় ওঠার সময় দীর্ঘকায় লোকটি বেশ একটু পিছনে ছিল। নরকঙ্কাল পাকা রাস্তা ধরে সামনের দিকে এগোতে জাফর তার পিছু নিল। দীর্ঘকায় লোকটি এর খানিক পরই গলি থেকে বেরিয়ে পাকা রাস্তায় ওঠে। ফলে জাফরের পিছনে পড়ে যায়।

নরকঙ্কাল এবং দীর্ঘকায় লোকটি পরস্পরকে পরাজিত করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ওদের মারামারি দেখতে দেখতে জাফর প্রাণপণে ছুট দিল।

দেখতে দেখতে অন্ধকার মাঠের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল জাফর।

নরকঙ্কাল দীর্ঘকায় লোকটির বুকের ওপর বসে পড়েছে ইতিমধ্যে। দীর্ঘকায় ছায়ামূর্তির গলা টিপে ধরেছে 'সে'।

ছায়ামূর্তি হঠাৎ দুই পা তুলে পেঁচিয়ে ধরল নরকঙ্কালের গলা। তারপর প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল নরকঙ্কালের মাথায়।

ছিটকে পড়ে গেল নরকঙ্কাল ছায়ামূর্তির বুক থেকে। কিন্তু পরমুহূর্তে উঠে দাঁড়াল সে।

এদিকে উঠে দাঁড়িয়েছে ছায়ামূর্তিও। দুজন দুজনের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। এমন সময়, কোথাও কিছু নেই, গুলির শব্দ শোনা গেল।

বিকট একটা আর্তরব বের হলো দুজনের একজনের গলা চিরে। দুই হাত উপর পানে তুলে দিয়ে হোঁচট খেয়ে দু'পা সামনে বাড়াল সে। তারপর শিকড়হীন গাছের মত সবেগে মুখ থুবড়ে পড়ল অপর জনের পায়ের কাছে। পড়েই নিঃসাড় হয়ে গেল তার দেহটা।

অপরজন তখন তাকিয়ে আছে বাঁ দিকে, দূরে। সেদিক থেকেই রাইফেলের গুলিটা এসেছে।

পাঁচ

পরদিন সকালে শুভ সংবাদ রটে গেল ইছাপুর গ্রামে—গত রাতে কোথাও ডাকাতি হয়নি। কিন্তু এই শুভ সংবাদকে অর্থহীন প্রমাণ করল একটি অশুভ সংবাদ।

পাকা রাস্তার উপর শেষ লাইটপোস্টের নিচে পাওয়া গেল লঞ্চমালিক গোলাম মাওলার লম্বা-চওড়া যুবক ছেলে সালামের লাশ।

সালামকে কে বা কারা গুলি করে খুন করেছে। তার হৃৎপিণ্ড ভেদ করে বেরিয়ে গেছে গুলি।

সালামের লাশকে ঘিরে করুণ এক দৃশ্যের অবতারণা হলো। সালামের মা, বোন, ভাই খবর পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল। ভীড় জমাল গ্রামের সব লোক। সকলের মুখেই এক কথা—এ কাজ সেই নরকঙ্কালের!

বেলা দশটার সময় মি. সিম্পসনও এলেন অকুস্থলে। ইন্সপেক্টর হায়দার আগেই পৌঁছেছিলেন। মি. সিম্পসন লাশ পোস্ট মর্টেমের জন্যে ঢাকায় পাঠিয়ে দেবার হুকুম দিয়ে গোলাম মাওলার বাড়িতে গিয়ে বৈঠকখানায় বসলেন। গোলাম মাওলা সাহেব ভয়ানক আঘাত পেয়েছেন। দুটি মাত্র ছেলে তাঁর। সালামই ছিল বড়। কালাম এখনও ছোট। সালামই ছিল তাঁর ভবিষ্যতের স্বপ্ন, আশা। মি. সিম্পসন সান্ত্বনা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা না করে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। কিন্তু মাওলা সাহেব কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। উত্তর দেবার মত মানসিক অবস্থা তাঁর নেই।

সালাম রাতে বাইরে বেরিয়েছিল কেন এ প্রশ্নের উত্তর বাড়ির কেউই দিতে পারল না।

আধঘণ্টা পর থানায় ফিরে ইন্সপেক্টরকে বললেন মি. সিম্পসন, 'লাশের আশেপাশে দু'জন লোকের পায়ের দাগ ছিল বলে মনে হয়। সালামের ছাড়াও আর

একজনের পায়ের দাগ ছিল ওখানে। কিন্তু বৃষ্টির পানিতে দাগ মুছে গেছে।

গভীর দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে ইন্সপেক্টরের চোখে মুখে। মি. সিম্পসনের দিকে তাকিয়ে রইলেন শুধু তিনি। মি. সিম্পসন বললেন, 'ঢাকায় আমার কাজ আছে। কবে আবার আসতে পারব জানি না। তবে প্রতিদিন এখানে যা যা ঘটে টেলিফোনে আমাকে জানাবেন, ইন্সপেক্টর।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

সংক্ষেপে উত্তর দিলেন ইন্সপেক্টর হায়দার।

মি. সিম্পসন বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর ইছাপুরের কয়েকজন লোককে সঙ্গে নিয়ে থানায় ঢুকল জাফর।

গতরাতে যা যা ঘটেছে সব খুলে বলল জাফর ইন্সপেক্টরকে। ইন্সপেক্টর যেন কূল দেখতে পেলেন জাফরকে পেয়ে। তাঁর থমথমে মুখ, গম্ভীর কণ্ঠস্বর, সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি দেখে ভয় পেয়ে গেল জাফর। একটার পর একটা আক্রমণাত্মক প্রশ্ন করে গেলেন ইন্সপেক্টর। সবশেষে তিনি কঠিন কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'নিশ্চয়ই সালামের সাথে তোমার শত্রুতা ছিল। তা না হলে কেন তুমি তাকে খুন করলে?'

জাফর ভীত চোখে তাকিয়ে রইল। ইন্সপেক্টরের কথা যেন সে শুনতে পায়নি। জিজ্ঞেস করল, 'জ্বী, হুজুর!'

'কেন খুন করেছ সালামকে?' ধমকে উঠলেন ইন্সপেক্টর বজ্রকণ্ঠে।

'আমি…আমি না, হুজুর! আমি কেন খুন করব—হায় আল্লা…!'

'রাখাল!' ইন্সপেক্টর হাঁক ছাড়লেন।

'জ্বী স্যার।'

'ব্যাটাকে সেলে ভরে রাখো। হাতের কাজ শেষ হোক তখন দেখব পেটের কথা কিভাবে বের করতে হয়! মারের চোটে ভূত সিধে হয় আর এ ব্যাটা তো মানুষ!

কেঁদে ফেলল জাফর। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। সেলে নিয়ে গিয়ে রাখা হলো তাকে। জাফরের সাথে যারা এসেছিল তারা ভয়ে ভয়ে পালিয়ে গেল যে-যার বাড়ির দিকে।

সেদিন রাতে আকাশে মেঘ করল না। প্রকাণ্ড একটা চাঁদ উঠল রাত দশটার দিকে। চাঁদের আলোয় ছবির মত ফুটে উঠল ইছাপুর গ্রামটা।

সালাম যেখানে খুন হয়েছে সেখানে পাহারায় রইল সাব ইন্সপেক্টর শরীফ এবং তিনজন কনস্টেবল। ইন্সপেক্টর হায়দার থানাতেই থাকবেন রাত বারোটা অবধি। বারোটার পর দলবল নিয়ে বের হবেন তিনি।

রাত সাড়ে বারোটার সময় দু'জন কনস্টেবলকে নিয়ে হাজির হলেন ইন্সপেক্টর। শরীফের সাথে কথাবার্তা হলো কিছু। শরীফ জানাল, 'এখনও তো কিছু দেখিনি। তবে গোটা রাতই পড়ে রয়েছে সামনে। কি হয় বলা যায় না।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'ভাটপাড়ার ওদিকে জমাদার সাকীর আছে। ওদিকে না গিয়ে আমি বরং চন্দ্রগ্রামে যাই একবার। যা আছে কপালে, তুমি কিন্তু ভয় কোরো না—ভূতই হোক, কঙ্কালই হোক, অশরীরী আত্মাই হোক, দেখা মাত্র গুলি করবে।

শরীফ চুপ করে রইল।

চলে গেলেন দু'জন কনস্টেবলকে নিয়ে ইন্সপেক্টর।

রাত বাড়তে লাগল।

সালাম যেখানে খুন হয়েছে গত রাতে তার পাশেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে শরীফ। কনস্টেবল তিনজন পাকা রাস্তার শেষ মাথায় যাচ্ছে একবার করে তারপর আবার ফিরে আসছে।

রাত আড়াইটার সময় শরীফ হাত ইশারায় ডাকল ওদেরকে।

ফিরেই আসছিল ওরা। সাব ইন্সপেক্টরের ডাকে দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। ওরা কাছে এসে দাঁড়াতে শরীফ মাঠের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখতে পাচ্ছ?'

দেখতে না পাবার কথা নয়। চাঁদের আলোয় গোটা মাঠটা দেখা যাচ্ছে। শ্মশানের দিক থেকে একজন লোক দ্রুত লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে কোনাকুনি ভাবে।

লোক নয়, কঙ্কাল। কঙ্কালের মুখটা পরিষ্কার এতদূর থেকে দেখা না গেলেও মুখের ধবধবে হাড়ে চাঁদের আলো পড়ায় চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না।

পচাগড়ের জঙ্গলের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে লোকটা। কালো একটা চাদর কঙ্কালের গায়ে। বাতাসে উড়ছে সেটা।

নির্বাক নিঃসাড় দাঁড়িয়ে রইল ওরা চারজন। কারও মুখে কথা নেই। কারও চোখে পলক নেই।

মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অদ্ভুত 'জিনিসটা'। আবার পা বাড়াল সে। ডানদিকে গেল কয়েক গজ। আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে আগের জায়গায় ফিরে এল।

'কিছু যেন খুঁজছে!' কয়েকবার ঢোক গিলে বলল শরীফ।

আর কেউ কোন মন্তব্য করল না। রাখাল বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। ভগবানকে ডাকছে সম্ভবত।

হাশেম কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। 'জিনিসটা' যখন মাঠের মধ্যে ছিল তখন সে দেখেছে বটে কিন্তু তারপর সেই যে চোখ বন্ধ করে রেখেছে আর খোলেনি।

রাইফেল নামাল জব্বার কাঁধ থেকে।

'গুলি করবে?'

শরীফ জিজ্ঞেস করল। সে-ও রিভলভারের জন্যে পকেটে হাত ঢুকিয়ে

দিয়েছে।

রাখাল চোখ বন্ধ করেই কাঁদ কাঁদ গলায় বলে উঠল, 'না! না! ভগবানের দোহাই…!'

শরীফ বলল, 'মনে হয় রাইফেলের গুলিও ঠিকমত যাবে না। অনেক দূর…।'

জব্বার রাইফেলটা পাকা রাস্তার উপর নামিয়ে রেখে বলে উঠল ফিসফিস করে, 'আমাকে মাফ করুন, স্যার। আমি পারব না।'

শরীফ জোর করে হাসার চেষ্টা করল। তুলে নিল সে রাইফেলটা।

রাইফেল তাক করে ট্রিগার টেপার পূর্ব মুহূর্তে 'জিনিসটা' নড়ে উঠল আবার।

এবার সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে 'সে'। জঙ্গলে ঢুকবে বলে মনে হচ্ছে। পালাচ্ছে নাকি? বুঝতে পেরেছে গুলি করা হবে? কিন্তু বুঝল কিভাবে? পিছন ফিরে তো একবারও তাকায়নি। তবে 'ওদের' কথাই আলাদা। ওদের জানতে বাকি থাকে না কিছু। ওরা সব দেখতে পায়, সারা গায়েই ওদের শত শত চোখ আছে…।

গর্জে উঠল শরীফের হাতের রাইফেল।

কিন্তু 'জিনিসটা' সাবলীল গতিতে জঙ্গলে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাকালও না একবার।

সে-রাতেও ডাকাতি হলো। ডাকাতি হলো ভোরের দিকে। সাব ইন্সপেক্টর শরীফ এবং তিনজন কনস্টেবল যেখানে ছিল দিনের আলো ফোটা অবধি সেখান থেকে মাত্র একশো গজের মধ্যে ডাকাতি হলো অথচ ওরা কিছু জানতেই পারল না।

এবার ডাকাতরা অন্য এক কৌশলে ডাকাতি করেছে। ডাকাতরা যে কী ভয়ঙ্কর প্রকৃতির, মায়ামমতা বলে যে কিছুই নেই তাদের, তা প্রমাণ হয়ে গেল সে রাতের ঘটনায়।

সালাম গত রাতে খুন হয়েছে। স্বভাবতই গোলাম মাওলা সাহেবের বাড়িতে নেমে এসেছে শোকের কালো ছায়া। ডাকাতরা চুপিচুপি গোলাম মাওলাদের বাড়িতেই ঢুকল। গোলাম মাওলার নাম ধরে ডাকাডাকি করে দরজা খোলায় তারা। গোলাম মাওলা একাই তখন জেগেছিলেন বিছানায়। ঘুমুতে পারছিলেন না তিনি।

দরজা খুলতেই ডাকাতরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গলা টিপে খুন করে তাকে ডাকাতরা। শুধু গোলাম মাওলাকেই নয়, একে একে তারা গোলাম মাওলার স্ত্রী, ছোট ছেলে এবং মেয়েকে খুন করে ঘুমন্ত অবস্থায়।

সালামের মৃত্যুর খবর শুনে ঘনিষ্ঠ কিছু আত্মীয় এসেছিল দূর-গ্রাম থেকে। তাদের মধ্যে একজনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সম্ভবত। ডাকাতরা সেই বৃদ্ধকেও খুন করে গেছে। গহনা আর টাকা, কিছুই রেখে যায়নি।

সকালে পাঁচটা লাশ পাওয়া গেল। চারটে বিছানাতেই। গোলাম মাওলার লাশটা পাওয়া গেল দোর গোড়ায়।

সারাটা দিন গ্রামের মানুষের খাওয়া দাওয়া হলো না। মি. সিম্পসন না এলেও উচ্চ পদস্থ কয়েকজন পুলিস অফিসার চাক্ষুষ করে গেলেন লোমহর্ষক দৃশ্যটা। ইন্সপেক্টর হায়দারের সাথে রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলাপ করলেন তাঁরা। তারপর চলে গেলেন রিপোর্ট নিয়ে।

মি. সিম্পসনকেও রিপোর্ট পাঠালেন ইন্সপেক্টর।

দিন গড়িয়ে রাত এল। গোটা এলাকায় নেমে এল আতঙ্ক। জানালা দরজা বন্ধ করে গ্রামবাসীরা সজাগ হয়ে বসে রইল। ক্রমশ গভীর হলো রাত। গোটা ইছাপুরে ছড়িয়ে পড়ল পঁচিশ তিরিশ জন কনস্টেবল ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে। পার্শ্ববর্তী থানা থেকে সাহায্য হিসেবে এসেছে বেশ কয়েকজন কনস্টেবল।

সে-রাতেও দেখা গেল সেই 'জিনিসকে'। শশ্মানের দিক থেকে এসে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করল সে। দূর থেকে দেখল 'তাকে' একদল কনস্টেবল। পাঁচ রাউণ্ড গুলিও করল তারা। কিন্তু একটি বুলেটও 'তার' গায়ে লাগল না। বেশ দূর থেকেই গুলি করেছিল পুলিসবাহিনীর লোকেরা।

সে-রাতে ডাকাতি হলো না।

ডাকাতি হলো না পরের রাতেও। কিন্তু সেই 'জিনিসকে' ঘুর ঘুর করতে দেখা গেল ঠিকই পচাগড় জঙ্গলের ধারে। ঘুর ঘুর করতে করতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকবার সে প্রবেশ করে জঙ্গলে।

দিন চারেক বেশ ভালই কাটল। কোথাও কোন ডাকাতি হলো না এই কদিন। ইন্সপেক্টর হায়দার আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন আবার। রোজ সন্ধ্যায় রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন তিনি মি. সিম্পসনের কাছে টেলিফোনে। ডাকাতি হয়নি এখবর শুনে মি. সিম্পসন খুশি। কিন্তু নরকঙ্কালের কথা শুনে রীতিমত খেপে ওঠেন তিনি।

পঞ্চম দিন সন্ধ্যায় মি. সিম্পসনকে ফোন করে গত রাতের রিপোর্ট দিলেন ইন্সপেক্টর। কথায় কথায় ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আমাদের এলাকায় আবার একবার আসুন না, স্যার।'

'কোন বিশেষ কারণ আছে?' জানতে চাইলেন মি. সিম্পসন।

একটু বিরতি নিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'আপনি এলে সাহস বাড়ে, স্যার। তাই বলছিলাম...।'

'আই সি। ঠিক আছে, যাব। তবে কবে যাব বলতে পারছি না। তাছাড়া ফোনে সে-কথা না বলাই ভাল, কি বলেন?'

'তা তো নিশ্চয়ই, স্যার।'

'কাল রিপোর্ট পাঠাবেন। ছাড়ছি।'

সন্ধ্যার সময় ফোনে আলাপ করলেন, মি. সিম্পসন ইন্সপেক্টর হায়দারের সাথে আর রাত ন'টার সময় তাঁকে দেখা গেল চন্দ্রগ্রামে।

স্পীড বোটে চড়ে চন্দ্রগ্রামে পৌঁছুতে খুব বেশি সময় লাগেনি মি. সিম্পসনের। কৃতিত্বটুকু অবশ্যি তার সঙ্গে সুদর্শন যুবকটির। সে-ই চালিয়ে নিয়ে এসেছে স্পীড বোট।

রাত ন'টাতেই চন্দ্রগ্রাম জনশূন্য, খাঁ খাঁ করছে। লঞ্চ ঘাটে স্পীড বোট রেখে নৌকা নিলেন মি. সিম্পসন। সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'কোন শব্দ করা চলবে না, রাসেল। খুব সাবধানে যেতে হবে আমাদেরকে। বিশেষ করে খালে ঢুকে।

ভারী গলায় মৃদু হাসি শোনা গেল মাত্র। রাসেল কথা না বলে ছেড়ে দিল নৌকো।

নৌকো এসে থামল পচাগড় জঙ্গলের ভিতর। নৌকো থেকে নেমে ওরা দুজন প্রবেশ করল জঙ্গলে।

খালটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। খাল থেকে ইছাপুরের শ্মশান বা মাঠ খুব বেশি দূরে নয়। ওরা যেখানে নৌকো থেকে নামল সেখান থেকে পঞ্চাশ কি ষাট গজ গেলেই জঙ্গল শেষ। জঙ্গলের যেখানে শেষ সেখানেই ইছাপুরের প্রকাণ্ড মাঠের শুরু। মাঠের উপর দিয়ে কোনাকুনি গেলে পড়ে শ্মশান।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে চলল ওরা। মি. সিম্পসনের হাতে রিভলভার। রাসেলের হাতেও রয়েছে একটা। আগে আগে হাঁটছেন মি. সিম্পসন। পিছনে দীর্ঘকায় রাসেল।

জঙ্গল শেষ হয়ে এসেছে। মি. সিম্পসন দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভাল করে দেখতে শুরু করলেন তিনি উঁকি মেরে সামনের দৃশ্যটা।

চাঁদের আলোয় সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সামনেই প্রকাণ্ড মাঠ। বহুদূরে পাকা রাস্তা। লাইটপোস্ট।

'এখানেই আসে, বুঝলে রাসেল,' মি. সিম্পসন ফিসফিস করে জানালেন।

'রোজ আসে? একদিনও বাদ যায় না?' প্রশ্ন করল রাসেল।

অন্যমনস্কভাবে মি. সিম্পসন বললেন, 'ইন্সপেক্টর হায়দারের রিপোর্ট তো সে-কথাই বলে।'

'আসুন।'

মি. সিম্পসন ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন রাসেলের দিকে। জানতে চাইলেন, 'কোথায়?'

'ওই বট গাছের আড়ালে বসি চলুন। আপনার নরকঙ্কাল গভীর রাত ছাড়া তো আসে না। খামকা দাঁড়িয়ে থেকে দুই পা বেচারীকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই।'

এগিয়ে চলল রাসেল।

প্রকাণ্ড বট গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসল ওরা।

রেডিয়াম লাগানো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় রাসেল বলল, 'মাত্র ন'টা

চল্লিশ হয়েছে। অন্তত চার ঘন্টা সময় পাচ্ছেন। ইচ্ছা করলে লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে নিতে পারেন। চিন্তা নেই, আমি জেগে থাকব।'

'শোব? ঘুমিয়ে নেব? এখানে? এই মাটিতে?' মি. সিম্পসন অবাক হয়ে বললেন।

হেসে ফেলল মৃদু স্বরে রাসেল। বলল, 'পুলিস অফিসারের দায়িত্ব পালন করছেন প্রায় দু'যুগ ধরে। অথচ এখনও পরিবেশের সাথে খাপ্ খাইয়ে চলতে শেখেননি দেখছি।'

'তা নয়…।'

মি. সিম্পসন কি বলবেন ভেবে পেলেন না। রাসেল প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে জিজ্ঞেস করল, 'কুয়াশা তাহলে এদিকেই আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি সন্দেহ করেন সে ডাকাতির সাথে জড়িত?'

'মনে হয় না।'

'সেক্ষেত্রে এখানে কেন সে?'

'সেটা তো আমারও প্রশ্ন।'

রাসেল একমনে খানিকক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, 'নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে কুয়াশার। উদ্দেশ্যটা সম্ভবত এই, ডাকাতদের সঞ্চিত সম্পদের মালিক হতে চায় সে। তারমানে চোরের ওপর বাটপারি করার উদ্দেশ্য নিয়েই কুয়াশা এদিকে এসেছে…।'

মি. সিম্পসন লাফিয়ে উঠে বললেন, 'এক্জ্যাক্টলি সো! থ্যাঙ্ক ইউ, মাই বয়। সত্যি, তোমার বুদ্ধির প্রসংশা না করে পারছি না। কথাটা একবারও আমার মাথায় খেলেনি…।'

বাধা দিয়ে রাসেল বলল, 'আস্তে কথা বলুন, মি. সিম্পসন। তা না হলে আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

বড় বড় মশার কামড় নীরবে সহ্য করতে করতে অপেক্ষা করছে ওরা।

রাত হয়েছে অনেক। চিনিকলের পেটা ঘড়িতে দুটো বেজেছে অনেক আগেই। আড়াইটা প্রায় বাজে। অধৈর্য হয়ে উঠছেন মি. সিম্পসন। বারবার বিরক্তি প্রকাশ করছেন তিনি। বলছেন, 'এমন জানলে আসতামই না।'

কোন রকমে হাসি চেপে অপেক্ষা করছে রাসেল। হঠাৎ একসময় মাঠের দিকে তাকিয়ে ও বলে উঠল, 'ওই যে, মি. সিম্পসন। তিনি আসছেন।'

রাসেলের গলায় ব্যঙ্গ ফুটে উঠলেও মি. সিম্পসন উত্তেজিত ভাবে সিধে হয়ে বসলেন। মাঠের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কই!'

'ভাল করে দেখুন—আসছে।'

খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ঠিকই একটি ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেলেন মি. সিম্পসন।

মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে চাঁদ। তবু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ছায়ামূর্তিকে। যদিও ছায়ামূর্তির চোখ-মুখ-নাক গাল বা তার পোশাক আশাক কিরকম তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু কেউ যে একজন এইদিকেই দ্রুত, প্রায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মাঠের উপর দিয়ে হন হন করে এগিয়ে আসছে ছায়ামূর্তি। মাঝেমধ্যে পিছন ফিরেও তাকাচ্ছে সে। পরনে সম্ভবত একটি আলখাল্লা, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। তবে কালো চাদরও হতে পারে ওটা, গায়ে জড়ানো।

দেখতে দেখতে একেবারে কাছে এসে পড়ল ছায়ামূর্তি। জঙ্গলের ধারে এসে এদিক ওদিক তাকাল সে চঞ্চল ভাবে। পা বাড়াল হঠাৎ, যেন জঙ্গলে ঢুকতে চায়। কিন্তু কি মনে করে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছন ফিরে তাকাল আবার। তারপর আবার চারদিকে তাকাল চঞ্চল ভাবে।

মি. সিম্পসন উঠে দাঁড়িয়েছেন। তার পাশেই রয়েছে রাসেল। দুজনের হাতেই রিভলভার। দুজনেই মোটা বট গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে ছায়ামূর্তিকে।

ছায়ামূর্তি ওদের কাছ থেকে মাত্র হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চঞ্চল ভাবে চারদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ সে পা বাড়াল।

আর দেরি করা উচিত নয়। মি. সিম্পসনের গায়ে একটা খোঁচা দিয়ে রাসেল লাফিয়ে পড়ল ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে।

চোখের পলক পড়তে না পড়তে দেখা গেল ছায়ামূর্তিকে দুই হাত দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ফেলেছে রাসেল।

ছায়ামূর্তি চিৎকার করছে আর্ত স্বরে, 'ও মাই গঁড! ও মাই গড হেল্প, মি. কুয়াশা হেলপ মি—ফর গড্স্ সেক…!'

ডি. কস্টাকে ছেড়ে দিয়ে চারদিক সচকিত করে দিয়ে হেসে উঠল রাসেল হাঃ হাঃ করে।

মি. সিম্পসন রাগে, দুঃখে পারলে নিজের চুল ছেঁড়েন। কোথায় নরকঙ্কাল। জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে ডি. কস্টা। অবিরাম চেঁচাচ্ছে সে। সাহায্য চাইছে কুয়াশার।

প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন মি. সিম্পসন ডি. কস্টাকে। ডি. কস্টা এতক্ষণে চিনতে পারল ওদেরকে। চিনতে পেরেই সে সামলে নিল নিজেকে। গায়ের কালো চাদরটা ঠিকঠাক করে নিয়ে সে ভারিক্কি চালে বলল, 'তা হাপনারা এডিকে কি উড্ডাশা নিয়ে উপস্হিট্ হইয়াছেন জানিটে পারি কি, মাই ফ্রেণ্ডস্?'

মি. সিম্পসন ধমকে উঠলেন, 'এত রাতে আপনি কেন এদিকে এসেছেন?'

হঠাৎ ডি. কস্টা চট্ করে বলে উঠল, 'বী কেয়ারফুল, ওরা আসিটেছে!'

'ওরা কারা?' জানতে চাইল রাসেল।

'ওরা? তা জানি না। বাট, আসিটেছে।'

'কেন আসছে?' আবার জিজ্ঞেস করল রাসেল।

'মার্ডার করিটে আসিটেছে। হামাকে ওরা মার্ডার করিটে চেষ্টা করিবে, মাই ফ্রেণ্ড। আমার ফ্রেণ্ডই হামাকে কেয়ারফুল ঠাকটে বলিয়া ডিয়াছেন।'

'কুয়াশা কোথায়, জানেন?' জানতে চাইলেন মি. সিম্পসন।

'জানি, অফকোর্স জানি। কিন্টু বলিব না।'

আচমকা চারদিক কাঁপিয়ে মাথার উপর থেকে গর্জে উঠল একটি রাইফেল।

চমকে উঠে উপর দিকে তাকাল ওরা। প্রকাণ্ড বট গাছের মগডালে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘকায় ছায়ামূর্তিকে।

ছায়ামূর্তির দিকে রিভলভার তুলে ধরল রাসেল এবং মি. সিম্পসন।

মি. সিম্পসন কঠোর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'যে-ই হও তুমি নেমে এসো ভালোয় ভালোয়।'

কিন্তু ছায়ামূর্তি তার আগেই নামতে শুরু করেছে গাছ থেকে। বড় অদ্ভুতভাবে গাছ থেকে নামছে সে।

বট গাছটা যেমন উঁচু তেমনি চওড়া। এক একটি প্রধান শাখায় একজন করে লোক শুয়ে থাকতে পারে। ছায়ামূর্তি গাছের মাথা থেকে বাদুড়ের মত দুই হাত বিস্তার করে শূন্যে লাফিয়ে পড়ছে। নামছে চওড়া একটি শাখায়। তারপর সেখান থেকে আবার লাফিয়ে পড়ছে নিচের একটি মোটা শাখার উপর। এমনি করে পাঁচ ছয়টা লাফ দিয়ে প্রকাণ্ড কালো বাদুড়ের মত মাটিতে এসে নামল ছায়ামূর্তি।

'সব গোলমাল করে দিয়েছেন আপনারা,' বলল কুয়াশা।

'তার মানে?'

ঝাঁঝাল গলায় বলে উঠলেন মি. সিম্পসন, 'কি বলতে চাও তুমি?'

কুয়াশা গম্ভীর স্বরে বলল, 'বলতে চাই আপনারা চেঁচামেচি করে সব নষ্ট করে ফেলেছেন। নির্ঘাৎ ধরতাম আজ ওদেরকে। কিন্তু⋯।'

'কাদেরকে ধরার কথা বলছ তুমি?' কৌতূহল দমন করতে না পেরে প্রশ্ন করলেন মি. সিম্পসন।

কিন্তু অন্য এক প্রশ্ন করে প্রসঙ্গ বদলে ফেলতে বাধ্য করল রাসেল, 'গুলি করলেন কাকে, মি. কুয়াশা?'

কুয়াশা জঙ্গলের ভিতর ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'চলো, দেখি। গুলি লেগেছে, তবে লাশটা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।'

'কার লাশ? কাকে গুলি করেছেন আপনি?' বেশ একটু কঠোর স্বরেই প্রশ্ন দুটো করল রাসেল।

কুয়াশা আগে আগে হাঁটতে হাঁটতে মুচকি হাসল। তারপর বলল, 'চলো, সব নিজের চোখেই দেখতে পাবে।' নীরবে কুয়াশাকে অনুসরণ করল ওরা।

খালের ধারে পৌঁছে কুয়াশা বলল, 'নৌকোটা কাজে লাগল। ওপারে যেতে হবে আমাদেরকে।'

রাসেলরা যে নৌকোয় এসেছিল সেই নৌকোয় চড়ে বসল ওরা চারজন।

খালের অপর পাড়ে নেমে কিনারা ধরে হাঁটতে লাগল কুয়াশা। পকেট থেকে একটা পেন্সিল টর্চ বের করেছে সে। টর্চের আলোয় পথ দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে খালের পাড় ধরে।

এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল কুয়াশা। তার দুই পাশে এসে দাঁড়াল রাসেল ও মি. সিম্পসন।

'রক্ত!' মি. সিম্পসন অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন।

কুয়াশা চারদিকে চোখ বুলাতে বুলাতে বলে উঠল, 'এখানেই গুলি খেয়েছে লোকটা। কিন্তু গেল কোথায়?'

রক্তের দাগ অনুসরণ করে খালের পাড় থেকে সরে ওরা জঙ্গলে প্রবেশ করল। আর মাত্র দশ গজ এগোবার পর আবার দাঁড়িয়ে পড়ল কুয়াশা।

সবাই দেখল লাশটাকে। লাশের মুখে কুয়াশার পেন্সিল টর্চ পড়ল। সুদর্শন এক যুবকের লাশ।

কুয়াশা নিচু গলায় শুধু বলল, 'জহুর ব্যাপারীর ছেলে কাদির।'

'জঙ্গলে কি করছিল?' মি. সিম্পসন প্রশ্ন করলেন।

রাসেল তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল সাথে সাথে, 'জঙ্গলে সে যে কারণেই আসুক, আপনি একে গুলি করে খুন করলেন কেন, মি. কুয়াশা!'

কুয়াশা সরাসরি তাকাল রাসেলের দিকে। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকার পর সে একটু হাসল। তারপর বলল, 'গুলি করার অবশ্যই কারণ ছিল। সে কারণ এখন বলব না। তবে একদিন বলব। কিন্তু আমার গুলিতে কাদির মরেছে একথা প্রমাণ করতে পারবে তুমি, রাসেল?'

কুয়াশার কথা শুনে লাশটার দিকে ভাল করে তাকাল রাসেল।

কুয়াশা বলল, 'আমি যখন ওকে লক্ষ করে বট গাছের ওপর থেকে গুলি করি তখন ওর পরনে সাদা রঙের প্যান্ট ছিল না। প্রমাণ করতে পারি আমি।'

কুয়াশাকে প্রমাণ করতে হলো না। রাসেলের চোখেই ধরা পড়ল ব্যাপারটা।

আশ্চর্য ব্যাপার সন্দেহ নেই। রাসেল দেখল কাদিরের ডান পায়ের উরুতে গুলি লেগেছে। অথচ সাদা প্যান্টের কোথাও ছিদ্র নেই এতটুকু। প্যান্ট ছিদ্র না করে বুলেট ঢুকল কি করে উরুতে?

এ রহস্যের একটিই সমাধান। গুলি লাগার পর প্যান্ট বদল করেছে কাদির। বদল করেছে বা বদল করতে বাধ্য হয়েছে কারও নির্দেশে।

'আরও একটি ব্যাপার লক্ষ করো। উরুতে গুলি খেয়ে কেউ এত তাড়াতাড়ি মারা যায় না। কাদিরও মারা যায়নি। ওকে হত্যা করা হয়েছে অন্য উপায়ে। ওর গলার দিকে ভাল করে তাকাও। আঙুলের দাগ দেখতে পাবে।'

কুয়াশার এ কথাও সত্য প্রমাণিত হলো।

মি. সিম্পসন বিমূঢ় হয়ে বলে উঠলেন, 'তারমানে কাদিরের সাথে আরও লোক ছিল। তারাই কাদিরকে খুন করে রেখে গেছে। কারণ কি? কাদির আহত হয়েছে বলে? ধরা পড়ে যাবে বলে? তবে কি কাদিররাই ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে একটার পর একটা?'

কুয়াশা হেসে ফেলল। বলল, 'এত প্রশ্ন?'

'তুমি জানো এসব প্রশ্নের উত্তর?'

কুয়াশা গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'সব জানি না। তবে জানতে আমাকে হবেই। সময় আসুক, আপনাদেরকেও জানাব। কথা দিচ্ছি।'

বিদায় নিয়ে চলে যাবার আগে একটি সিগারেট কেস উপহার দিল কুয়াশা রাসেলকে। বলল, 'এটা সবসময় সঙ্গে সঙ্গে রেখো। মিনি ওয়্যারলেস। দরকার হলে তোমাকে ডাকব। চললাম।'

কুয়াশার দীর্ঘ শরীরটা দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের ভিতর।

ছয়

সে রাতে ডাকাতি হলো না। কিন্তু চন্দ্রগ্রামের মাতবরের ছেলে ইয়াসিনকে পাওয়া গেল না কোথাও।

ইয়াসিন পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক। লেখাপড়া মোটামুটি শিখেছিল। কিন্তু আচার ব্যবহারে তার কোন ছাপ ছিল না। জুয়া খেলত, মদ খেত। মাঝেমধ্যে ঠিকাদারীর কাজ করে ভাল পয়সাই পেত।

সেদিন রাতে যথারীতি খাওয়াদাওয়া সেরে নিজের ঘরে ঘুমুতে যায় সে। পরদিন সকালে উঠে দেখা যায় তার ঘরের দরজা খোলা। ভিতরে সে নেই।

নেই তো নেই-ই। সারাদিন খুঁজেও তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

রাত নামল। কিন্তু ইয়াসিন ফিরল না বাড়িতে।

মাতবরের স্ত্রী সারা দিন ধৈর্য ধরে ছিল। কিন্তু রাত নামার সাথে সাথে গলা ছেড়ে কাঁদতে শুরু করল। মাতবর শুকনো মুখে পায়চারী করতে লাগল শুধু।

রাত বারোটার দিকে ক্লান্ত হয়ে মাতবরের প্রৌঢ়া স্ত্রী কান্না থামিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

বাঘের মুখোশ মুখে লাগিয়ে একদল লোক মাতবরের বাড়ির পিছন দিকের দেয়ালের উপর চড়ে বসেছে তখন।

এমন সময় কালো আলখাল্লা পরিহিত এক দীর্ঘকায় ছায়ামূর্তিকে দেখা গেল

মাতব্বরের বাড়ির দোতলার ছাদে।

ছায়ামূর্তি ছাদের কিনারায় শুয়ে পড়ল ধীরে ধীরে। তার হাতে একটি রাইফেল। পাশে একটি স্টেনগান।

পাঁচিলের উপর উঠে বসেছে লোকগুলো। দোতলার ছাদ থেকে ছায়ামূর্তি গুলি করল পাঁচিলের উপর দাঁড়ানো একটি লোককে লক্ষ্য করে।

রাইফেলের গর্জনে চারদিকের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

গুলিবিদ্ধ লোকটি পড়ে গেল পাঁচিলের নিচে, বাড়ির বাইরে। অপর লোকগুলো সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র বাগিয়ে ধরে ব্রাশ ফায়ার করতে শুরু করল এদিক সেদিক।

দোতলার ছাদে শোয়া অবস্থায় ছায়ামূর্তি এবার তুলে নিল স্টেনগানটা।

স্টেনগানের ফাঁকা শব্দ করল এবার সে। চোখের পলকে পাঁচিলের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল বাঘের মুখোশ পরা লোকগুলো। নেমেই তারা প্রাণপণে ছুটল।

দোতলার ছাদ থেকে পাইপ বেয়ে নামল ছায়ামূর্তি নিচে। তারপর দৌড়ে গেল পাঁচিলের কাছে।

বুলেটবিদ্ধ লোকটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। মুখোশ পরিহিত লোকটি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ছায়ামূর্তি আচমকা লোকটার কপালের ডান পাশে সজোরে একটি লাথি মারল।

স্থির হয়ে গেল লোকটার দেহ। জ্ঞান হারিয়েছে সে ছায়ামূর্তির লাথি খেয়ে। জ্ঞান ফিরতে অন্তত একঘণ্টা লাগবে লোকটার।

মুখোশ পরা লোকগুলো যে পথ ধরে পালিয়েছে সেই পথ ধরে ছুটতে লাগল ছায়ামূর্তি।

মুখোশ পরা লোকগুলো দ্রুত হাঁটছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। নিচু গলায় উত্তেজিতভাবে কথা বলছে তারা। সংখ্যায় তারা মোট ছয় জন। সবচেয়ে মোটা এবং ভারী লোকটা কর্কশ গলায় বারবার বলছে, 'ওস্তাদ গেল কোথায়! ওস্তাদকে তো পাঁচিলের ওপর দেখিনি!'

অন্য একজন বলল, 'ওস্তাদ বড় চালাক লোক। টের পেয়েছিল সে আগে। কেটে পড়েছে বিপদ দেখেই।'

'আমরা এখন করবটা কি?' জানতে চাইল অপর একজন।

সবচেয়ে বেঁটে লোকটি বলল, 'কি আর করব। আস্তানায় অপেক্ষা করি চলো। ওস্তাদ আসুক।'

মোটা লোকটা দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল, 'কিন্তু ওস্তাদ যদি না ফেরে? গুলিটা করল কে বলো দেখি। আচ্ছা, ওস্তাদের লাগেনি তো গুলি?'

কয়েকজন একযোগে বলে উঠল, 'দূর! দূর!'

অন্য একজন বলল, 'ওস্তাদ খাবে গুলি? উঁহু, ওস্তাদের মরণ এত তাড়াতাড়ি হতেই পারে না—।'

দ্রুত পায়ে, সশব্দে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা কথা বলতে বলতে। কেউ যে ওদেরকে অনুসরণ করতে পারে সে কথা ভুলেও ভাবছে না ওরা।

কিন্তু দীর্ঘাকৃতি সেই ছায়ামূর্তি ঠিকই অনুসরণ করে চলেছে ওদের ছয়জনকে।

খালের ধারে এসে দাঁড়াল ওরা। নৌকো ছিল আগে থেকেই। নৌকো করে খাল অতিক্রম করল ওরা। ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে নামল খালে। দ্রুত সাঁতার কেটে অপর পাড়ে পৌঁছুল সে। ছয়জন লোক তখন জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়েছে। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই, ছায়ামূর্তি তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে।

মুখোশ পরা লোকগুলো আরও দশ মিনিট একনাগাড়ে হাঁটার পর প্রকাণ্ড একটি বট গাছের সামনে এসে দাঁড়াল। এদিক ওদিক না তাকিয়ে ছয়জনের একজন বটগাছের মোটা কাণ্ডের গায়ে হাত দিয়ে একটি বোতাম খুঁজতে লাগল।

বোতামটা পাওয়া গেল নির্দিষ্ট জায়গাতেই। বোতামে চাপ দিল লোকটি। বট গাছের মোটা কাণ্ডের গায়ে দেখা গেল ছোট একটি দরজা।

দরজা গলে একে একে ছয়জন প্রবেশ করল বট গাছের ভিতর।

ছায়ামূর্তি মাত্র তিন হাত দূর থেকে ছয়জন মুখোশ পরা লোকের কীর্তিকলাপ সবই দেখল।

বট গাছের গায়ের দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল আপনা আপনি। ছায়ামূর্তি সেখানে আর দাঁড়াল না।

একটা ঝড় যেন জঙ্গল ভেদ করে খানিকপর বেরিয়ে এল চন্দ্রগ্রামে। ঝড় নয়, একজন দীর্ঘাকৃতি মানুষ, সেই ছায়ামূর্তি।

মাতবরের বাড়ির ভিতর তখন মহা শোরগোল শুরু হয়ে গেছে। গুলির শব্দে ছুটে এসেছেন মি. সিম্পসন, রাসেল, শরীফ এবং কয়েকজন কনস্টেবল। ইন্সপেক্টর হায়দার কাছে পিঠে নেই। তাকে মি. সিম্পসন সন্ধ্যার পরই পাঠিয়েছেন মধুগ্রামে।

মাতবরের বাড়ি পুলিসের বুট জুতোর শব্দে মুখর হয়ে উঠেছে।

এদিকে প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ছায়ামূর্তি বাড়ির পিছন দিককার পাঁচিলের কাছে এসে দাঁড়াল।

মুখোশ পরা জ্ঞানহীন লোকটি সেই আগের জায়গাতেই নিঃসাড় পড়ে আছে।

ছায়ামূর্তি দ্রুত লোকটার পোশাক খুলে পরে নিল নিজে। নিজের পোশাক পরিয়ে দিল লোকটাকে। ছায়ামূর্তি মুখোশটা পরতেও ভুলল না।

জ্ঞানহীন লোকটিকে ছায়ামূর্তি অবলীলাক্রমে তুলে নিল নিজের কাঁধে। তারপর আবার সে দ্রুত পা বাড়াল জঙ্গলের দিকে।

কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারল না মাতবর। তবে একটা কথা বাড়ির সবাই স্বীকার

করল—দু'দলে গুলি বিনিময় হয়েছে।

রাসেল বলল, 'মি. সিম্পসন এভাবে সময় নষ্ট করার কোন মানেই হয় না। চলুন বাড়ির চারপাশটা ভাল করে একবার দেখি। প্রথম থেকেই কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে আমার।'

'কি সন্দেহ হচ্ছে তোমার?'

রাসেল বলল, 'মাতবর সাহেব বলছেন, তার বাড়ির ছাদ থেকে কেউ গুলি চালিয়েছে। এর অর্থ কি? নিশ্চয়ই কাউকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে গুলি। গুলি যখন বাড়ির পিছন দিকে চালানো হয়েছে ছাদ থেকে ওদিকে নিশ্চয়ই এমন কিছু পাওয়া যাবে⋯।'

রাসেলের কথা শেষ হলো না, তার আগেই ওর পকেট থেকে যান্ত্রিক শব্দ বের হলো, 'কিরিং কিরিং!'

মি. সিম্পসন খানিকটা উত্তেজিত হয়েই বলে উঠলেন, 'কুয়াশা কথা বলতে চাইছে!'

পকেট থেকে সিগারেট কেস সদৃশ ওয়্যারলেসটা বের করে রাসেল। ক্ষুদ্র একটি বোতাম টিপে মুখের সামনে তুলে ধরে বলল, 'রাসেল বলছি।'

ইথারে ভেসে এল কুয়াশার কণ্ঠস্বর, 'তোমরা মাতবরের বাড়িতে রয়েছ, তাই না? তা যেখানেই থাকো, পচাগড়ের জঙ্গলে ঢোকো, যদি ধরতে চাও ডাকাত দলকে। আমি পথের হদিস দিচ্ছি। খাল পেরিয়ে প্রথমে খুঁজে বের করবে পাশাপাশি একজোড়া পেয়ারা গাছ। ডান পাশের গাছটায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াবার পর সোজা নাক বরাবর যেদিক মনে হয় সেদিক পানে হাঁটবে। পঞ্চাশ গজ হাঁটলেই আমার দেখা পাবে। খুব সাবধানে এসো। মি. সিম্পসনকেও নিয়ে এসো। এবং তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীকেও নিয়ে আসতে ভুলো না।'

'ঠিক আছে।'

কানেকশন অফ করে দিল কুয়াশা।

দেরি হচ্ছে দেখে খানিকটা আগে বেড়ে গিয়েছিল কুয়াশা। আচমকা একটি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক ছায়ামূর্তি।

'হ্যাণ্ডস্ আপ!' গর্জে উঠল ছায়ামূর্তি।

কুয়াশা থমকে দাঁড়াল। কিন্তু হাত মাথার উপর না তুলে মৃদু স্বরে হেসে উঠে সে বলল, 'আমাকে চিনবার কথা নয়, কিন্তু তবু আমি কুয়াশা।'

মি. সিম্পসন রিভলভার নামিয়ে নিয়ে অবাক গলায় বললেন, 'তোমার এ ছদ্মবেশ কেন?'

পিছন থেকে মৃদু শব্দে হেসে উঠল রাসেল। ঘুরে পিছন দিকে তাকাল কুয়াশা। বলল, 'ও তুমি পিছনে ছিলে? ভাল ফাঁদ, বলতে হয়।'

কুয়াশা বাঘের মুখোশ খুলে ফেলে বলল, 'এসো তোমরা আমার সাথে।'

কুয়াশার পিছন পিছন সেই প্রকাণ্ড বট গাছের নিচে এসে দাঁড়াল ওরা।
কুয়াশা প্রশ্ন করল, 'আপনার দলবল কই?'
'আসছে ওরা। নৌকোয় জায়গা হয়নি তাই–।'
খানিকপরই দশ-বারোজন কনস্টেবলকে নিয়ে সাব-ইন্সপেক্টর শরীফ উদ্দীন হাজির হলো।
কুয়াশা বট গাছের মোটা কাণ্ডের গায়ে লাগানো বোতামটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা টিপলেই ছোট একটি গুপ্ত দরজা দেখা যাবে। দরজার কাছ থেকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে। সিঁড়ির পর ছোট একটি প্যাসেজ। প্যাসেজের শেষ মাথায় একটি কামরা। সেই কামরাতেই আছে ডাকাতরা। মোট ছয়জন ওরা। কিন্তু ওদের সর্দার, নেতা বা ওস্তাদকে ওখানে পাবেন না।'
'সে কি পালিয়েছে?' জানতে চাইলেন মি. সিম্পসন।
'না। সে আছে কাছে পিঠেই। ইঞ্জেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে রেখেছি তাকে। এখুনি দেখতে চান, না, দলের অন্যদেরকে গ্রেফতার করার পর দেখতে চান?'
রাসেল জিজ্ঞেস করল, 'বট গাছের নিচের কামরায় যারা আছে তারা কি সশস্ত্র?'
কুয়াশা বলল, 'না।'
রাসেল বলল, 'তাহলে শরীফ সাহেবই দলবল নিয়ে ওদেরকে গ্রেফতার করতে পারবেন। আমরা বরং দলের ওস্তাদকেই দেখে আসি।'
'তাই হোক।' বলল কুয়াশা।
কুয়াশা শরীফকে আর একবার বট গাছের নিচে যাবার কায়দা কানুন শিখিয়ে দিয়ে বলল, 'শব্দ না করেই যাবার চেষ্টা করবেন। এরা একমাত্র ওদের ওস্তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। খানিক আগে আমি গিয়ে কথা বলে এসেছি, ওদের ওস্তাদের ছদ্মবেশ ধরে। সুতরাং হাঙ্গামা এড়াতে হলে শব্দ করবেন না। অবশ্য ভয়ের কিছু নেই। ওরা সবাই নিরস্ত্র এবং পালাবার পথ একটাই। চলুন মি. সিম্পসন।'
কুয়াশা পা বাড়াল। পিছন পিছন চলল রাসেল এবং মি. সিম্পসন।
বেশ খানিকটা দূর যাবার পর কুয়াশা জিজ্ঞেস করল, 'ইন্সপেক্টর সাহেবকে যে দেখলাম না?'
মি. সিম্পসন বললেন, 'তাকে মধুগ্রামে পাঠিয়েছি।'
'কেন?'
'ওদিকেও তো ডাকাতরা হামলা করতে পারে। সেকথা ভেবেই...।'
মৃদু হাসল কুয়াশা।
'হাসলে কেন?' জিজ্ঞেস করলেন মি. সিম্পসন। উত্তর দিল না কুয়াশা। খানিক পর মি. সিম্পসন বিরক্তির সাথে বললেন, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তুমি? লোকটাকে এত দূরে রাখার কারণ কি?'

'এই তো, এসে গেছি।' কথাটা বলেই দাঁড়িয়ে পড়ল কুয়াশা।

সামনেই একটি ঝোপ। ঝোপের ভিতর থেকে একটি পা ধরে টেনে বের করে আনল কুয়াশা নিঃসাড় একটি লোককে।

'কে বলুন তো এ লোক?'

'অন্ধকারে কিছুই তো দেখছি না?'

কুয়াশা হাতের পেন্সিল টর্চ জ্বালল। পেন্সিল টর্চের আলোয় জ্ঞানহীন ডাকাত সর্দারের মুখ দেখতে পেল ওঁরা।

চমকে উঠল রাসেল।

চমকে উঠলেন মি. সিম্পসন। অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত পর তিনি বলে উঠলেন, 'কিন্তু এ যে অসম্ভব! ইন্সপেক্টর হায়দার ডাকাতদের সর্দার!'

'না, এ লোক ইন্সপেক্টর হায়দার নয়,' বলল কুয়াশা।

'এ তোমার কিরকম ঠাট্টা, কুয়াশা! পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি...।'

কুয়াশা বলল, 'ভুল দেখছেন।'

কথাটা বলেই নিঃসাড় লোকটার গোঁফ ধরে টান মারল কুয়াশা। উঠে এল নকল গোঁফ।

'এ কি!' সবিস্ময়ে বলে উঠলেন মি. সিম্পসন।

কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ, এই গোঁফ ব্যবহার করেই প্রতিটি লোককে ফাঁকি দিচ্ছে এই লোক। প্রকৃত ইন্সপেক্টর হায়দারের সাথে এর চেহারার মিল আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রকৃত ইন্সপেক্টর হায়দারের গোঁফ ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই লোক সেই গোঁফ নকল করে বাজি মাত করে। গোঁফেই ঢাকা পড়ে যায় প্রকৃত ইন্সপেক্টর হায়দারের সাথে এর চেহারার অমিল।'

'প্রকৃত ইন্সপেক্টর হায়দার তাহলে কোথায়?'

'তিনি নিহত হয়েছেন আজ একমাস আগে এই ডাকাতদলেরই একজনের হাতে। লাশ গুম করে ফেলে এই লোক ইন্সপেক্টর হায়দার হয়ে বসে সাধারণ মানুষের চোখকে ফাঁকি দিয়ে।'

'এ লোক তাহলে এতদিন...।'

মি. সিম্পসনকে বাধা দিয়ে কুয়াশা বলে, 'হ্যাঁ। এতদিন বোকা বানিয়ে রেখেছিল এ আপনাদেরকে।'

মি. সিম্পসন জানতে চাইলেন, 'তুমি এসব জানলে কিভাবে?'

কুয়াশা হাসল। বলল, 'কিভাবে জানলাম সে কথা বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে। আমার সময় খুব কম। যেতে হবে অন্যত্র। ছোটখাট কোন প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করুন।'

'নরকঙ্কালের রহস্যটা কি?'

কুয়াশা বলল, 'এই ডাকাতদলে শুধু নকল হায়দারই নয়, এই থানা এলাকার অনেক যুবক ছেলেও আছে। আছে দু'জন পুলিস কনস্টেবল। নঈম এবং সোহরাব। একটা জিনিস লক্ষ করেছেন কোনদিন? নকল ইন্সপেক্টর যখনই রাতে বাইরে বের হত তখনই দু'জন কনস্টেবলকে নিয়ে বের হত। এবং সে দু'জন সবসময়ই নঈম এবং সোহরাব হত। ওদের দু'জনকে নিয়ে নকল ইন্সপেক্টর সুযোগ মত চলে আসত ওই বটগাছের নিচে নিজেদের আস্তানায়। সেখানে একে একে মিলিত হত আরও অনেকে। তারা আসত মুখোশ পরে। নরকঙ্কালের মুখোশ দেখেছেন কখনও? প্লাস্টিকের হয় ওগুলো। সেই মুখোশ পরে বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রতিদিন গুপ্ত আস্তানায় আসত ওরা।'

'কেন...?'

'যাতে লোকে ওদেরকে প্রশ্ন না করে, ধারে কাছে না ঘেঁষে, যাতে কেউ চিনতে না পারে, যাতে ভয় পায়—বুঝেছেন এবার? আস্তানার সবাই একত্রিত হয়ে বাঘের মুখোশ পরত ওরা। নকল ইন্সপেক্টর এবং তার দুই কনস্টেবল পুলিসের ইউনিফর্ম খুলে ফেলত। তারপর বের হত ডাকাতি করতে। ডাকাতি শেষ করে আবার ওরা ফিরে আসত এখানে। তারপর নকল ইন্সপেক্টর ও তার দুজন কর্মচারী খাকী পোশাক পরে নিত । কঙ্কালের মুখোশ পরে নিত অন্যান্যরা। তারপর বেরিয়ে পড়ত যে যার গন্তব্যস্থানের দিকে।'

'গোলাম মাওলা সাহেবের ছেলেকে কে হত্যা করে? জাফর?'

কুয়াশা বলল, 'না। জাফরকে সালাম আক্রমণ করেছিল। সালামের মুখে ছিল কঙ্কালের মুখোশ। সালামকে আমি অনেক আগে থেকেই অনুসরণ করেছিলাম। জাফরকে সে যখন আক্রমণ করে তখন আমি তাকে বাধা দিই। ফলে জাফর মুক্ত হয়ে পালিয়ে যাবার সুযোগ পায়। মারামারি শুরু হয় আমার সাথে নরকঙ্কালের মানে সালামের। এমন সময় হঠাৎ একটি গুলি কোথা থেকে যেন এসে লাগে সালামের বুকে। এ কাজটাও এই নকল হায়দারের।'

'তারমানে সালামও ছিল ডাকাতের দলে। কিন্তু সেক্ষেত্রে পরের রাত্রে সালামের বাড়িতে ডাকাতি হলো কেন? কেন সালামের বাবাকে খুন করা হলো?'

'নকল হায়দারের ভয় ছিল সালামের বাবা গোলাম মাওলা সব কথা জানেন। তাই তাকে খুন করার জন্যেই ডাকাতি করতে যায় সে।'

'সেদিন বট গাছের ওপর থেকে যাকে তুমি গুলি করলে, মানে কাদিরের কথা বলছি, সেও তাহলে ডাকাতদের দলে ছিল।'

'ছিল। এবং কাদিরকেও নকল ইন্সপেক্টর খুন করে।'

'ইয়াসিনকে গ্রামে পাওয়া যাচ্ছে না কেন জানো?'

কুয়াশা বলল, 'সঠিক জানি না। তবে অনুমান করে বলতে পারি। আমার বিশ্বাস ইয়াসিনও ছিল এদের সঙ্গে। সালাম এবং কাদির খুন হতে নকল ইন্সপেক্টরের

ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে সে। তাই পালিয়ে যায়। পালানো ছাড়া নকল ইন্সপেক্টরের হাত থেকে বাঁচা যাবে না মনে করেই…।'

'মাতবরের বাড়ির ছাদ থেকে গুলি করে কে?'

'আমি। ডাকাতরা গিয়েছিল ওখানে।'

'জানলে কি করে ওরা যাবে?'

'ইয়াসিন পালিয়ে গেছে অনুমান করেই আমি বুঝতে পারি নকল ইন্সপেক্টর আজ হামলা চালাবে মাতবরের বাড়িতে।'

এতক্ষণ পর হেসে উঠল কুয়াশা। তারপর বলল, 'আরও প্রশ্ন করবেন?'

'আর মাত্র একটি। সেদিন বটগাছের মাথায় চড়েছিলে কেন তুমি?'

'ক'দিন থেকেই আমি ডাকাতদের আস্তানা খোঁজার জন্যে নরকঙ্কালের মুখোশ পরে ওদিকে রাতের দিকে যেতাম। মুখোশটা আমি পেয়েছিলাম সালামের কাছ থেকে। আমি ওদিকে যাওয়া আসা করায় ডাকাতদের বেশ অসুবিধে হয়। ওদের আসা যাওয়ার সহজ পথ ছিল ওটাই। তিন চারদিন ডাকাতি করতে পারেনি ওরা। ব্যাপারটা আমি টের পাই। ফলে সেদিন আগে থাকতেই বট গাছের মাথায় গিয়ে চড়ি। অনুমান করেছিলাম ডাকাতরা পথের কাঁটা সরাবার জন্যে আমাকে খুন করবার চেষ্টা করবে। সে চেষ্টা তারা করেছিল। কিন্তু আপনাদের গলা শুনে পিছিয়ে যায় তারা। আমি বটগাছের উপর থেকে সবাইকে দেখতে না পেলেও কাদিরকে দেখতে পেয়েছিলাম।'

কুয়াশার কথা শেষ হতেই রাসেল বলল, 'ডাকাতরা ডাকাতি করে টাকা, সোনা রাখত কোথায়? নিশ্চয়ই সেগুলো ওদের গোপন আস্তানায় আছে?'

কুয়াশা বলল, 'আমার মনে হয় ওদের গোপন আস্তানার কোথাও গোপন কুঠুরী আছে। সেখানেই আছে টাকা-পয়সা, সোনাদানা। আচ্ছা, মি. সিম্পসন, এবার আমাকে বিদায় নিতে হয়। আবার দেখা হবে।'

কথাগুলো বলে আর কোন প্রশ্নের অবকাশ না দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল কুয়াশা।

পিছন থেকে মি. সিম্পসনকে কি যেন বললেন, উত্তরে কুয়াশা বলল, 'যারা ধরা পড়েছে তাদেরকে জেরা করলেই সব পাবেন। চললাম।'

ভোর হয়ে আসছে।

দ্রুত ফিরে এল ওরা বট গাছের কাছে।

ইন্সপেক্টর শরীফকে পাঠিয়ে দিলেন মি. সিম্পসন নকল ইন্সপেক্টরের দেহটাকে নিয়ে আসার জন্যে।

রাসেল একজন ডাকাতকে জিজ্ঞেস করল, 'টাকা পয়সা সোনা কোথায় রেখেছ তোমরা?'

চুপ করে রইল সবাই। কেউ কোন কথা বলতে চায় না।

রাসেল বলল, 'চুপ করে থাকলে পিঠের ছাল তুলে নেব। ভেবো না চুপ করে থাকলে...'

একজন বলে উঠল, 'খোদার কসম বলছি হুজুর, আমরা জানি না...।'

প্রচণ্ড এক চড় মারল রাসেল লোকটার গালে।

অপর একজন লোক বলে উঠল, 'এখন আর না বলে লাভই বা কি! ধরা তো পড়েই গেছি। শোনেন, হুজুর। আমরা ধরা পড়ার আগে আমাদের ওস্তাদ মানে ইন্সপেক্টর হায়দার সাহেব টাকার দুটো ট্রাঙ্ক আর সোনা ভর্তি একটি ট্রাঙ্ক আস্তানা থেকে বের করার নির্দেশ দেন। আমরা সেগুলো বের করে দিই। তারপর তার দেখাও পাইনি, আর...।'

আর কোন কথা শোনার দরকার ছিল না। মি. সিম্পসন এবং রাসেল দুজনই সেই মুহূর্তে বুঝতে পারল যে এ কাজ কুয়াশা ছাড়া আর কারও না।

রাসেল বলল, 'কুয়াশা পালাবে, মি. সিম্পসন! তাকে পালাতে দেয়া উচিত হবে না!'

'কিন্তু তাকে ধরবে কিভাবে তুমি?'

রাসেল একমুহূর্ত চিন্তা করেই লাফিয়ে উঠল। বলল, 'চলুন! নিশ্চয়ই সে আমাদের স্পীড বোটে করে পালাবার চেষ্টা করবে। চলুন, এখুনি চলুন।'

ছুটল ওরা।

কিন্তু ওরা পৌঁছুবার এক মিনিট আগেই স্পীড বোটের শব্দ শোনা গেল। স্টার্ট নিচ্ছে বোট।

ছুটতে ছুটতে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়াল ওরা।

স্পীড বোট তখন মাঝ দরিয়ায় চলে গেছে। বোটের উপর তিনটি ট্রাঙ্ক দেখা যাচ্ছে। একটি ট্রাঙ্কের উপর বসে রয়েছে হ্যাট পরিহিত একজন লোক। নিঃসন্দেহে লোকটি স্যানন ডি. কস্টা।

কুয়াশা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বোটের ড্রাইভিং হুইল ধরে রয়েছে। পানি কেটে সবেগে দূরে সরে যাচ্ছে স্পীড বোটটা।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল কুয়াশা। বোধহয় হাসল। ঠিক বোঝা গেল না।

ডি. কস্টা ন্যাট কিং কোল-এর একটি বিখ্যাত গানের কলি আওড়াচ্ছিল মনের সুখে মাথা দোলাতে দোলাতে। হঠাৎ সে নদীর তীরে দেখতে পেল মি. সিম্পসন এবং রাসেলকে।

মাথার হ্যাটটা খুলে ওদের দিকে সেটা নাড়তে লাগল—বাই বাই...টা টা...

মি. সিম্পসন যেন নিজের উপরই রাগে, দুঃখে ক্ষোভে বলে উঠলেন, 'কী সাংঘাতিক! আবার বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পালিয়ে গেল কুয়াশা!'

কুয়াশা ৩৮

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই, ১৯৭৩

এক

কালো রাত। ঘন কালো মেঘে ঢাকা আকাশ। বৃষ্টি ভেজা পিচ্ছিল পীচঢালা রাস্তার উপর দিয়ে তুমুল বেগে উড়ে চলছে যেন কালো রঙের বিরাট হিলম্যান গাড়িটা। স্টিয়ারিঙ থেকে ডান হাতটা সরিয়ে নিয়ে খানিকটা উপরে তুলে ঝাঁকি দিতেই আলখেল্লার আস্তিন সরে গেল। হাতটা চোখের সামনে নিয়ে এল কুয়াশা।

লিউমিনাস ঘড়িতে বাজে রাত এগারোটা।

নির্জন রাস্তা। হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় সামনের রাস্তাটা বহুদূর অবধি দেখা যাচ্ছে।

রাস্তার দুই পাশেই ফাঁকা মাঠ। মাঠের শেষে, অনেক দূরে, বহুতল বিশিষ্ট বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। ঘাড় ফিরিয়ে আবার পিছন দিকে তাকাল কুয়াশা। অন্ধকারে দেখা গেল না এবারও কিছু।

দেখা না গেলেও পঞ্চাশ গজ পিছনেই অস্টিন কেমব্রিজ গাড়িটা আছে। নাছোড় বান্দার মত অনুসরণ করে আসছে অস্টিনের আরোহীরা কুয়াশাকে। হেডলাইট অফ করে দিয়েছে ওরা। সাইডলাইটও। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এক সেকেণ্ড চিন্তা করল কুয়াশা। তাকাল ড্যাশবোর্ডের উপর পাশাপাশি বসানো সাতটা প্লাস্টিক বোতামের দিকে।

সাতটা বোতামের কাজ সাত রকম। বোতাম টেপা মাত্র কাজ শুরু হয়ে যায়। সাতটার মধ্যে একটির রঙ লাল। লাল মানে ডেঞ্জার, বিপদের প্রতীক। লাল বোতামটার ওপর আঙুল রেখে চাপ দেবার সাথে সাথে ঘটে যাবে কল্পনাতীত এক অঘটন। এতবড় গাড়িটা চোখের পলকে সহস্র টুকরো হয়ে যাবে।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল আবিষ্কার করা কুয়াশার অনেক নেশার অন্যতম। মানুষের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে সে। তার ধারণা মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারে একমাত্র বিজ্ঞানই। তাই বিজ্ঞানের পূজারী সে।

অন্য বোতামগুলোর রঙ কালো।

লম্বা, কালো আলখেল্লার পকেট থেকে বড় সাইজের একজোড়া মোটা রঙিন কাচ ফিট করা একটি চশমা বের করল কুয়াশা। ধীরে ধীরে ডান হাতটা ড্যাশবোর্ডের বোতামগুলোর দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

কালো একটি বোতামে চাপ দিল কুয়াশা।

ছড়িয়ে পড়ল ইনভিজিবল রে হিলম্যানের পিছন দিকে। কিন্তু দেখা গেল না কিছুই।

এবার চশমাটা পরে নিল কুয়াশা। চোখের সামনে নেমে এল ঘন কালো অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না কুয়াশা। অথচ হেডলাইট দুটো ঠিকই জ্বলছে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল কুয়াশা।

আগের মতই অন্ধকার আছে পিছনে। কিন্তু কুয়াশার চোখে পিছন দিকের বহুদূর অবধি আলোকিত দেখাচ্ছে।

মাত্র পঁচিশ গজ পিছনে রয়েছে অস্টিনটা। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কুয়াশা। অস্টিনের ড্রাইভার বা আরোহীরা টের পায়নি কিছুই। টের পাবার কথাও নয়। ইনভিজিবল রে কুয়াশার আবিষ্কৃত বিশেষ চশমা না পরে চাক্ষুষ করা অসম্ভব।

ঘাড় ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকাল কুয়াশা। সামনের রাস্তাটা অন্ধকারে ঢাকা।

কুয়াশা যে চশমা পরেছে সে চশমা পরে স্বাভাবিক আলোর কিছুই দেখা যায় না। টের পাওয়া যায় না সে আলোর অস্তিত্ব।

চোখ থেকে চশমা নামিয়ে ড্যাশবোর্ডের বোতামগুলোর দিকে আর একবার তাকাল কুয়াশা। ডান হাতটা এগিয়ে গেল আবার তার।

এবার কুয়াশা অন্য একটি বোতামে চাপ দিল।

লোকগুলো বিদেশী। শ্বেতাঙ্গ। ছোট ছোট করে আমেরিকান স্টাইলে ছাঁটা চুল, পেশীবহুল লম্বাচওড়া চেহারা। বড় বড় মুখ। ক্লিনশেভড্। প্রত্যেকেরই বয়স বাইশ থেকে আটাশের মধ্যে। চোখের দৃষ্টি সতর্ক। গতকাল সকাল থেকে পিছু লেগেছে ওরা কুয়াশার।

কুয়াশা গতরাতটা কাটিয়েছে ঢাকায় তার তিন নাম্বার ল্যাবরেটরিতে। আজিমপুরের একটি বাড়িতে তিন নাম্বার ল্যাবরেটরি। বাড়ির আশপাশে ঘুর ঘুর করেছে লোকগুলো গাড়ি নিয়ে সারাটা রাত। তারপর আজ সকাল থেকে এই গভীর রাত অবধি কুয়াশাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছে ওরা।

অথচ আক্রমণাত্মক কোন তৎপরতা দেখায়নি ওরা এখন অবধি। কুয়াশা প্রথম থেকেই জানে ওদের অনুসরণের কথাটা। কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই জানে না সে।

উদ্দেশ্যটা ওদের জানার জন্যে গতকাল থেকে অপেক্ষা করে ছিল কুয়াশা। জানতে পারেনি সে। অনুসরণ করা ছাড়া ওদের আর কোন তৎপরতা টের পায়নি কুয়াশা।

দ্বিতীয় কালো বোতামটায় চাপ দেয়ার সাথে সাথে সশব্দে সবেগে একটি বুলেট বেরিয়ে গেল গাড়ির পিছনের লাল বাল্‌বের পাশের ছোট একটি গর্ত থেকে।

গর্তটা রাইফেলের নলের গর্তের মতই দেখতে।

অস্টিনের সামনে উইণ্ডস্ক্রীন ভেদ করে কুয়াশার আবিষ্কৃত বুলেট ভিতরে গিয়ে পড়ল। উইণ্ডস্ক্রীনের সাথে বুলেটটার ধাক্কা লাগার সাথে সাথে ফেটে গেল সেটা।

ড্যাশবোর্ড থেকে তুলে চশমাটা পরে নিল কুয়াশা আবার। তাকাল সে পিছন ফিরে অস্টিনের দিকে।

সাদা ধোঁয়ায় ভরে গেছে অস্টিনের ভিতরটা। আরোহী কিংবা ড্রাইভার কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

চাকার সাথে পিচ্ছিল রাস্তার ঘষা লাগার প্রকট শব্দ উঠল। তীব্র একটা ঝাঁকানি দিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল অস্টিন।

প্রায় একই সময়ে ব্রেক কষে দাঁড় করাল কুয়াশা নিজের গাড়ি।

অস্টিনের ভিতর সাদা ধোঁয়ার মেঘ। দেখা যাচ্ছে না কিছু। স্টার্ট দেয়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়িটা। ভিতর থেকে কেউ নামছে না।

কোন রকম চিৎকার বা শোরগোলের শব্দও ভেসে আসছে না অস্টিনের ভিতর থেকে।

স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে হিলম্যান থেকে নেমে পড়ল কুয়াশা।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হিলম্যানের ভিতরটা ছিল শীতল। বাইরে বেরুতেই মৃদু গরম বাতাসের ঝাপটা লাগল চোখে মুখে।

চশমাটা খোলেনি কুয়াশা চোখ থেকে। লম্বা লম্বা পা ফেলে অস্টিনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। আলখেল্লার পকেট থেকে একটি মাস্ক বের করে পরে নিল এবার। তারপর হাতল ঘুরিয়ে খুলে ফেলল অস্টিনের সামনের দরজাটা।

সামনের সীটে ড্রাইভার ছাড়াও একজন আরোহী রয়েছে। পিছনের সীটে একজন।

ড্রাইভারের কোলে মাথা রেখে শুয়ে রয়েছে সামনের লোকটা। পিছনের সীটের লোকটি এক কোণে কুণ্ডুলী পাকিয়ে রয়েছে। ড্রাইভার স্টিয়ারিঙের উপর মাথা ঠেকিয়ে পড়ে রয়েছে নিঃসাড়।

জ্ঞান হারিয়েছে ওরা। বিষাক্ত ধোঁয়া নাক দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করা মাত্র অচেতন হয়ে ঢলে পড়েছে তিনজন।

সামনের সীটের আরোহী এবং ড্রাইভারকে টেনে বের করল কুয়াশা। অবলীলাক্রমে দুজনকে দুই কাঁধে তুলে নিয়ে ফিরে এল সে গাড়ির কাছে।

হিলম্যানের পিছনের সীটে জ্ঞানহীন তিনজন শ্বেতাঙ্গকে তুলে দিয়ে নিজে আবার ড্রাইভিং সীটে বসল কুয়াশা।

অস্টিন সার্চ করে কোন তথ্য পায়নি সে। লোকগুলোর উদ্দেশ্য জানতে হলে জেরা করতে হবে। জ্ঞান ফিরতে এখনও এক ঘণ্টা লাগবে ওদের।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিল কুয়াশা। ফিরতি পথে মিনিট দুয়েক গাড়ি চালিয়ে মোড় নিল

সে ডানদিকে। প্রকাণ্ড একটি লোহার গেটের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল হিলম্যান।

গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মরিস। মরিসের পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল কুয়াশা। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকাল এদিক-ওদিক।

গেট খোলা কেন? গার্ড নেই কেন গেটে?

গাড়ি বারান্দার সামনে এবং দুই পাশে সুন্দর বাগান। বাগানের ভিতর থেকে উঁকি মারছে একটি মুখ। কুয়াশার দৃষ্টি সেদিকে পড়ার আগেই মুখটি একটি গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কুয়াশার এই নতুন বাড়ির বাগানে লুকিয়ে রয়েছে রাসেল। কিছুদিন থেকে কুয়াশার গতিবিধি কথাবার্তা কেমন যেন রহস্যময় ঠেকছে—তাই রাসেল কুয়াশার মুভমেন্ট লক্ষ করার জন্যে ওত পেতে আছে।

গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে রাসেল দেখল কুয়াশা এদিকেই তাকিয়ে আছে। দেখে ফেলেছে নাকি? কথাটা মনে হতেই রাসেলের চোখমুখ মলিন হয়ে উঠল। ধরা পড়ে গেলে বড় লজ্জায় পড়তে হবে। সরাসরি সামনে এসে দাঁড়িয়ে তার একটি হাত ধরে হয়তো বলবে, 'ফুল নিতে এসেছ বুঝি? তাহলে বললেই তো হত, মালী পেড়ে দিত। এসো, ড্রয়িংরূমে বসে গল্প করতে করতে কফি পান করি।'

আশ্চর্য একটা মস্ত হৃদয় আছে কুয়াশার। মনে মনে স্বীকার না করে পারে না রাসেল। সে কুয়াশার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে। কুয়াশা কোন অপরাধ করে কিনা দেখার জন্যে, অপরাধ করলে তার প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে দিনরাত হন্যে হয়ে ফেরে অথচ কুয়াশা সব জেনেশুনেও তার কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করেনি। ক্ষতি করা তো দূরের কথা বিপদে পড়লে সে তাকে উদ্ধার করার জন্যেই যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শত্রুকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করা শুধুমাত্র কুয়াশার পক্ষেই সম্ভব।

করিডরে উঠে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল কুয়াশা। নির্জন করিডর। ডানদিকের করিডরে এসে পৌঁছুল কুয়াশা। শেষ প্রান্তের একটি রূমের দরজা খোলা দেখা যাচ্ছে। পর্দা ঝুলছে দরজায়। স্যানন ডি. কস্টার রূম থেকে একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

ভাষণ দিচ্ছে ডি. কস্টা।

কুয়াশা মুচকি হেসে এগিয়ে চলল ডি. কস্টার রূমের দিকে।

ইউরেনিয়ামের খোঁজে ফিরছিল কিছুদিন থেকে কুয়াশা। বিশেষ এক ধরনের ইউরেনিয়াম যুক্ত বালি নাকি পাওয়া যায় কক্সবাজারের সমুদ্রতীরে। খবর পেয়ে গিয়েছিল কুয়াশা।

আণবিক শক্তি উৎপাদনে ইউরেনিয়াম একটি অপরিহার্য পদার্থ। হাইড্রোজেন বোমা, যে বোমা এতবড় পৃথিবীকে ধ্বংস করার শক্তি রাখে, বানাতে গেলেও লাগে ইউরেনিয়াম।

কক্সবাজারে সে ধরনের বালি পেলেও ইউরেনিয়াম পায়নি কুয়াশা। পরিমাণ নিতান্ত কম। ওর প্রয়োজন মিটবে না এখানে।

অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ভিক্টোরিয়া ডেজার্টে সেই বালি আছে শত শত মাইল ব্যাপী। নমুনা পেয়েছে কুয়াশা। ড. মূরকোট কুয়াশার অনুরোধে মাত্র তিন দিন আগে গ্রেট ভিক্টোরিয়া মরুভূমির এক পাউণ্ড বালি পাঠিয়েছেন। নমুনা দেখেই কুয়াশা বুঝে ফেলেছে ইউরেনিয়াম আছে ওখানে।

বালি পরীক্ষা করে পরদিনই কুয়াশা তা কন্ট্রোলরুমের প্রকাণ্ড ট্র্যান্সমিটারের সাহায্যে সুদূর অস্ট্রেলিয়ার নূলারবর প্লেনের বিশাল বনভূমিতে বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছে। বে অভ বেঙ্গলের তীরে যেমন বাংলাদেশ তেমনি গ্রেট অস্ট্রেলিয়ান বাইটের তীরে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া অবস্থিত। ইউক্লা, উলডি, মেডুনা ফরেস্ট, জানথুস ইত্যাদি নিয়ে নূলারবর প্লেন। এক হাজার মাইল লম্বা, পঁচিশ থেকে তিন শ মাইল প্রস্থ ভূখণ্ড। তারপর গ্রেট ভিক্টোরিয়া মরুভূমি। নূলারবর প্লেনের কোন এক জঙ্গলে আদিবাসীদের মধ্যে বাস করেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. মূরকোট। কুয়াশা যাচ্ছে সেখানে। আগামী পরশু রওনা হবে সে। কক্সবাজারে অপেক্ষা করছে 'গাঙচিল'। কুয়াশার সর্বাধুনিক ইয়ট। ড. মূরকোটকে রওনা হবার দিন-তারিখ জানিয়েই বার্তা পাঠিয়েছে কুয়াশা।

একদিন আগে ডি. কস্টার পৌঁছবার কথা কক্সবাজারে। আজ রাতেই তার ঢাকা থেকে রওনা হবার কথা।

রওয়ানা হবার আগে ডি. কস্টা চেয়েছিল বাড়ির সবাই মিলে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানাবে। একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করবে। বিয়োগান্তক একটি নাটিকা মঞ্চস্থ করার উদ্যোগ নেবে সবাই। সবশেষে তার জন্যে সবাই দু'এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে।

কিন্তু হা হতোস্মি! ডি. কস্টার মনের আশা কেউ বুঝতে সক্ষম হলো না। তার বিদায় লগ্ন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল সবাই তত আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠতে লাগল। চোখের জল ফেলা তো দূরের কথা।

অবশেষে খেপে উঠল ডি. কস্টা।

ড্রাইভারকে গাড়ি বের করার নির্দেশ দিল সে। যাকে তাকে অকারণে এটা আনতে বলল, ওটা করতে বলল। বাড়ির পাহারাদারকে বললঃ ফ্রম নাউ অন আই অ্যাম ইন এ গ্রেট ডেঞ্জার। অ্যাট এনি মোমেন্ট হামার উপর অ্যাটাক হইটে পারে। বিকজ হামি একটি সিক্রেট অ্যাসাইনমেন্ট নিয়া ওয়ার্লডের ক্ষুদ্রটম মহাডেশে যাইটেছি। হামার এবং হামার বস্, সরি, বণ্ড মি. কুয়াশার এনিমি আছে এভরিহোয়্যার। টারা হামাডেরকে, বিশেষ করিয়া হামাকে মার্ডার করিটে চায়। বাড়ি পাহারা ডিবার চেয়ে বেশি ডরকার এখন টোমার হামাকে পাহারা ডেয়া। যটোক্ষণ হামি এ বাড়িটে আছি টটোক্ষণ টুমি হামাকে পাহারা ডাও, অ্যাজ এ

বডিগার্ড…।

ডি. কস্টার কথা শেষ হবার আগেই ড্রাইভার রূমে ঢুকে জানাল, 'মি. ডি. কস্টা, গাড়ি বের করেছি।'

প্রায় একসাথে আরও দুজন রূমে ঢুকল। রূমে ঢুকে দুজন দুটো হাত বাড়িয়ে দিল ডি. কস্টার দিকে। দুজনের হাতেই দুটো কাচের গ্লাস। একটি গ্লাসে দুধ। অন্য গ্লাসে বাংলা মদ।

আড়চোখে গ্লাস দুটো দেখে নিল একবার ডি. কস্টা। কিন্তু হাত বাড়িয়ে দুটো গ্লাসের কোনটাই না নিয়ে গভীর মনোযোগের সাথে টাইয়ের নট্ ঠিক করতে লাগল সে। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাথার হ্যাটটা সিধে করে নিল।

'আপনার স্টিমার ক'টায়, মি. ডি. কস্টা? দেরি হলে যে ছেড়ে দেবে…।' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার। কিন্তু মাঝ পথে থেমে গেল ডি. কস্টার চাউনি দেখে।

কড়া দৃষ্টিতে তাকাল ডি. কস্টা ড্রাইভারের দিকে। বলল, 'বেয়াডপ কোথাকার। জানো টুমি, কার সাটে কঠা বলিটেছো? ইংরেজের জাট হামি, টাইম সম্পর্কে নেটিভডেরকে শট শট বছর ঢরিয়া শিক্ষা দিয়া আসিটেছি! আর টুমি কিনা হামাকে উপডেশ ডিটেছো…।'

হঠাৎ থেমে গেল ডি. কস্টা। একে একে তাকাল সকলের দিকে। তারপর গলার স্বর বদলে অত্যন্ত গর্বিত ভঙ্গিতে বলল, 'টোমরা ডেকছি সবাই এখানে উপস্ঠিট হইয়াছ। গুড, গুড। টোমরা জানো, হামি আজ ঢাকা ট্যাগ করিয়া কক্সেসবাজার যাইটেছি। ফ্রম দেয়ার হামি রওয়ানা হইব টুয়ার্ডস্ অস্ট্রেলিয়া। সঙ্গে লইব মি. কুয়াশাকে। টাকে ছাড়া হামি এনজয় করিটে পারি না কিছু। হউক সে নেটিভ, বাট আই লাভ হিম ভেরি মাচ। কারণ হইল এই যে নেটিভডের মধ্যে হামি হামার সমান বুড্ডিমান একজনকেও ডেখি নাই, একমাত্র মি. কুয়াশাকে ছাড়া। যডিও কোন কোন ম্যাটারে টার বুড্ডি এখনও কাঁচা। যেমন ইকনমি সে বুঝিটে পারে না। মিলিয়ন অ্যাণ্ড মিলিয়ন টাকা ইনকাম করে মি. কুয়াশা, বাট, সব খরচ করিয়া ফেলে নেটিভপুওর ম্যানদের জন্যে। এটা—ভেরি ভেরি ব্যাড। গরীবডেরকে হেলপ করিয়া কোন লাভ নাই। বাট সে হামার কঠায় কান ডেয় না। কারণ ইকনমি বোঝে না সে—। যাহা হউক, টবু টাকে হামি লাভ করি। টাই হামাডের ডেশে যাইবার সময় টাকে নিয়ে যাইটেছি…।'

বাড়ির গার্ড ফস্ করে বলে ফেলল, 'আপনার দেশ মানে? আপনি তো অ্যাংলো, বাংলাদেশেই জন্মেছেন।'

'স্টপ! ইডিয়েট কাঁহিকে। হামি ইংরেজের জাট…।' চিৎকার করে উঠল ডি. কস্টা। কিন্তু হঠাৎ সে চুপসে গেল দোরগোড়ায় কুয়াশাকে দেখতে পেয়ে।

ভারি গলায় কুয়াশা জিজ্ঞেস করল. 'আপনি স্টিমার ধরতে যাননি, মি. ডি.

কস্টা?'

ডি. কস্টা গম্ভীর গলায় বলল, 'এই যাইব আর কি। হামাকে বিডায় ডেবার আগে এরা সবাই চাইল একটি ফেয়ার ওয়েলের ব্যবস্থা করিটে, টাই···।'

'সময় পেরিয়ে গেছে স্টিমারের,' কুয়াশা বলল। 'আজ আর গিয়ে লাভ নেই। যাগৃগে আপনি এদেরকে নিয়ে আমার গাড়ি থেকে তিনজন বিদেশী লোককে নামিয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেলে রেখে আসার ব্যবস্থা করুন। জ্ঞান ফিরতে ঘণ্টা খানেক দেরি হবে ওদের। জ্ঞান ফিরলে আমাকে জানাবেন।'

কথাগুলো বলে দরজা থেকেই ফিরে গেল কুয়াশা।

কুয়াশা অদৃশ্য হয়ে যেতে ডি. কস্টা একে একে সকলের দিকে তাকাল।

'ফেয়ার ওয়েল মানে কি, মি. ডি. কস্টা?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

উত্তর দিল না ডি. কস্টা। শব্দটার অর্থ কেউ জানে না বুঝতে পেরে স্বস্তি পেল সে। ঢোলা প্যান্টে ঢাকা সরু সরু পা দুটো দরজার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে গম্ভীর স্বরে আদেশ করল সে, 'হামাকে ফলো করো টোমরা।'

'কিন্তু গ্লাসের দুধ আর বাংলা মদ···।'

একজন কথাটা বলতেই ডি. কস্টা চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল।

'ডাও, ড্রিঙ্ক না করে গেলে ব্যাটা নেটিভ বণ্ডীডেরকে পেটাই করিটে মজা পাইব না।'

ঢক ঢক করে এক গ্লাস বাংলা মদ পান করল ডি. কস্টা। তারপর দুধের গ্লাসটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে চোখ বন্ধ করে সেটুকু নিঃশেষ করল এক চুমুকে। তারপর চিৎকার করে বলল, 'ফলো মি!'

গাড়ি বারান্দার নিচে এসে দাঁড়াল ডি. কস্টা। তার পিছনে সার বেঁধে এসে দাঁড়াল গার্ড, ড্রাইভার এবং চাকরদ্বয়।

আলো জ্বলছে গাড়ির ভিতর।

ডি. কস্টা হিলম্যানের জানালা দিয়ে ভিতরে মাথা গলিয়ে দিয়েই চিৎকার করে উঠল, 'ফর গডস সেক, চিড়িয়া ভাগিয়া গিয়াছে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। হিলম্যানের ভিতরে তিনজন বিদেশী লোক থাকার কথা। অজ্ঞান অবস্থায়। কিন্তু অজ্ঞান বা সজ্ঞান কোন অবস্থাতেই কেউ নেই গাড়ির ভিতর।

ডি. কস্টা জানালা থেকে মাথা বের করে রীতিমত লাফাতে লাগল, 'মি. কুয়াশাকে খবর ডাও। এনিমিরা পলাইয়া গিয়াছে। ড্রাইভার, গাড়ি স্টার্ট ডাও! ফলো করতে হোবে এনিমিডেরকে। সার্চ করো বাড়ি—হামার রুমের ভিতরে লুকাইয়া থাকিটে পারে দুশমনরা, হামার উপর ওদের আক্‌কোরোশ আছে···।'

ড্রাইভার গার্ডের উদ্দেশ্যে বলল, 'এমনটি যে হবে তা আমি জানতাম। মদের ওপর দুধ খেলে মাথা বিগড়ে যাবেই তো...!'

ডি. কস্টা ছুটল কুয়াশাকে দুঃসংবাদ জানাতে। ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে বলছে সে, 'মি. কুয়াশা, বী কেয়ারফুল! ডুশমন পলাইয়াছে, আপনার আশেপাশেই আছে টাহারা...!'

এক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি বারান্দার নিচে এসে হাজির হলো কুয়াশা।

'বাড়ির ভিটরই কোঠাও ডুশমনরা... ।'

'আপনি চুপ করে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ান,' গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল কুয়াশা।

উঁচু করিডরে উঠে পড়ল ডি. কস্টা। অন্যান্যরা আগেই উঠে পড়েছে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করল কুয়াশা। গাড়ির সীট, দরজা, গাড়ি বারান্দার পাকা মেঝে, পার্শ্ববর্তী বাগান কিছুই বাদ দিল না সে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস চোখে লাগিয়ে গাড়ি বারান্দার পাকা মেঝে পরীক্ষা করে দু'জোড়া বুট জুতোর ছাপ পেল কুয়াশা। তার মানে কুয়াশা গাড়ি রেখে চলে যাবার পর দু'জন লোক এসেছিল গাড়ির কাছে। তারাই জ্ঞানহীন শ্বেতাঙ্গগুলোকে নিয়ে গেছে।

কিন্তু তারা এল কোন পথে? গেলই বা কিভাবে? কুয়াশা জানে কোন গাড়ি তাকে অনুসরণ করেনি।

দু'জোড়া জুতোর ছাপ কোন্ দিক থেকে এসেছে পরীক্ষা করতে শুরু করল কুয়াশা।

সময় লাগল না বিশেষ। জুতো জোড়ার দাগ গেটের দিকে যায়নি। গেছে বাগানের দিকে। বাগানের মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে থেমেছে দাগগুলো। তারপর আর কোন হদিস নেই।

বাগানের মাটি পরীক্ষা করতে করতে ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে উঠছিল কুয়াশার চোখমুখ।

জুতো জোড়ার ছাপ যেখানে এসে থেমেছে সেখানে একটি ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখতে পেল কুয়াশা।

ঘোড়া এল কোথা থেকে?

কোন্ দিক থেকে যে ঘোড়াটা বাগানে এসেছিল তা বুঝবার কোন উপায় নেই। বাগানের মাটিতে একটি ঘোড়ার চারটি পায়ের দাগ ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। ঘোড়াটা যে হেঁটে এসেছে তার কোন প্রমাণ নেই। হেঁটে এলে অসংখ্য পায়ের দাগ থাকার কথা। তা নেই। যেন আকাশ থেকে নেমেছিল ঘোড়াটি। আবার আকাশেই উড়ে গেছে।

আরও খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে কুয়াশা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল আকাশের দিকে।

নির্মল, মেঘমুক্ত আকাশ। নক্ষত্রদের মেলা বসেছে গোটা আকাশ জুড়ে। সেখানে আর কিছু নেই।

গাড়ি বারান্দা থেকে করিডরে উঠে নিজের ল্যাবরেটরির দিকে এগিয়ে চলল কুয়াশা। বড় চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে।

কুয়াশাকে নিঃশব্দে চলে যেতে দেখে ডি. কস্টা কি যেন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও শেষ অবধি সাহস পেল না।

কুয়াশা অদৃশ্য হয়ে যেতে ড্রাইভার ও গার্ড ছেঁকে ধরল ডি. কস্টাকে।

'ব্যাপার কি?' জানতে চাইল গার্ড। ভয় পেয়েছে সে।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'মনিবকে খুব চিন্তিত মনে হলো, তাই না?'

গার্ড বলল, 'এর মধ্যে রহস্য আছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি বুঝতে পারলাম না…।'

ডি. কস্টা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, ভেংচে বলে উঠল, 'কিন্টু ব্যাপারটা কি বুঝিটে পারলাম না! আরে, হামি আঙরেজের বাচ্চা হামিই বুঝিটে পারিলাম না আর টোরা টো নেটিভ, কালা আদমী…!'

দুই

ল্যাবরেটরিতে এসে ঢুকল কুয়াশা সোজা। ল্যাব-এর দরজা বন্ধ করে একটি চেয়ারের দিকে পা বাড়াতেই যান্ত্রিক ধ্বনি ভেসে এল পাশের কন্ট্রোলরুম থেকেঃ বীপ্-বীপ! বীপ-বীপ্—টক্-টক্-টক্কা, টক্-টক্-টক্কা…।

ল্যাবের মেঝেতে দাঁড়িয়ে কন্ট্রোলরুমের দরজার দিকে তাকাল কুয়াশা। ওভারসীজ মেসেজের সঙ্কেত। সাতসমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকে কেউ মেসেজ পাঠাচ্ছে।

বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। লম্বা আল-খেল্লার পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে কন্ট্রোলরুমের ভিতর ঢুকল সে।

মিনি সাইজের যন্ত্র থেকে শুরু করে দৈত্যাকার বিরাট বিরাট যন্ত্রে কন্ট্রোলরুম ঠাসা। বিরাটাকার ট্র্যান্সমিটারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। একটা পর্দায় লাল, নীল, সবুজ এবং নীল রঙের সরল রেখা ছুটোছুটি করছে এক কোণ থেকে আর এক কোণ অবধি। পার্শ্ববর্তী একটি বোর্ডে জ্বলছে বিভিন্ন রঙের বালব্। কোন কোনটা জ্বলে উঠছে কোন কোনটা দপ্ করে নিভে যাচ্ছে। স্পীকারে ভেসে আসছে নানারকম যান্ত্রিক শব্দ। সঙ্কেত!

উঁচু টেবিল থেকে কাগজ কলম টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করল কুয়াশা সঙ্কেতগুলো।

লিখতে লিখতে বিস্ময় ফুটে উঠল কুয়াশার চোখে মুখে।

বার্তা পাঠাচ্ছেন মঁসিয়ে মূরকোট। তিনি বলছেন, 'আই অ্যাম ইন ডেঞ্জার। হেলপ মি, মি. কুয়াশা। কাম শার্প!'

আশ্চর্য ব্যাপার। বার্তা পাঠালেন মঁসিয়ে ড. মূরকোট, কিন্তু উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই কানেকশন কাট্ করে দিলেন।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে মাত্র তিন দিন আগে কুয়াশা যখন কথা বলেছিল এই কন্ট্রোলরুম থেকে তখন ড. মূরকোট নিজের বিপদের কোন আভাস দেননি।

ড. মূরকোট জানেন, কুয়াশা অতি শীঘ্র রওনা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে। তা সত্ত্বেও দ্রুত তার কাছে যেতে বলছেন তিনি। কি এমন বিপদে পড়লেন বৃদ্ধ? হঠাৎ কি এমন বিপদ ঘটতে পারে তাঁর?

তবে বিপদটা নিশ্চয়ই মারাত্মক ধরনের। তা না হলে বৃদ্ধ এমন জরুরীভাবে কুয়াশার সাহায্য চাইতেন না।

কন্ট্রোলরুম থেকে বেরিয়ে ল্যাবরেটরিতে এসে বসল কুয়াশা। টেবিলের উপরকার একটি বোতাম টিপে দিল সে।

দেড় মিনিট পরই ল্যাবরেটরির দরজার বাইরে ডি. কস্টার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মে আই কাম ইন?'

'আসুন, মি. ডি. কস্টা।' কুয়াশা বলল। তার হাতে ভারত মহাসাগরের একটি ম্যাপ।

ডি. কস্টা মাথার হ্যাট ঠিক করতে করতে ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করল। কুয়াশার দিকে সতর্ক চোখে তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'ইয়েস?'

কুয়াশা ম্যাপের উপর চোখ রেখে বলল, 'রাসেলের হোস্টেল চেনেন আপনি?'

'দ্যাট পুওর চাইল্ড! হাপনাডের সুইট বাংলা ভাষায় যাহাকে বলে শিশু! কি ডরকার বলুন ওই শিশুর ঠিকানা জানিয়া...!'

'দরকার আছে। চেনেন কিনা বলুন,' কুয়াশা বলল।

'না, চিনি না। একবার চিনিটে ট্রাই করিয়াছিলাম, আই মীন, ফলো করিয়াছিলাম, কিন্টু হামাকে তাড়া করিয়াছিল বলিয়া সাকসেসফুল হইটে পারে নাই অ্যাসাইনমেন্টটা...।'

'ঠিকানা লিখে নিন,' কুয়াশা বলল।

ঠিকানা লিখে নিল ডি. কস্টা।

'টাকে, দ্যাট শিশুকে, কি বলিটে হইবে?' জিজ্ঞেস করল ডি. কস্টা।

'বলবেন আমি তাকে দেখা করতে বলেছি আজ রাতেই। আগামীকাল সকালে আমরা কক্সবাজারের উদ্দেশে রওনা হব। আমার কপ্টারে যাব। কালকেই পৌঁছুতে হবে ওখানে। কালকেই রওনা দেব অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে। সব কথা জানাবেন ওকে। ও যদি যেতে চায় তাহলে আজ রাতের মধ্যেই এখানে আসতে বলবেন। যান।'

ডি. কস্টা প্রায় লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল ল্যাবরেটরি থেকে।

রাসেলের সাথে কথা হয়েছিল শহীদের বাড়িতে কুয়াশার। শহীদকে দেখতে গিয়েছিল কুয়াশা। সেখানে ছিল রাসেল। শহীদের খোঁজ খবর নিতে রোজই একবার করে যায় রাসেল।

শহীদ বাইরের দুনিয়ার সাথে সব সম্পর্কচ্ছেদ করে নিজের লাইব্রেরির নির্জন কোণে রাতদিন বই নিয়ে পড়াশোনা করে চলেছে। কুয়াশা, রাসেল এবং মি. সিম্পসন ছাড়া সে আর কারও সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে না। সাক্ষাৎ প্রার্থীর সংখ্যা অসংখ্য হলেও সবাইকেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়। চাকরবাকররা ডেকে স্নান করায়, তাগাদা দিয়ে খাওয়ায়। পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে গেলে ঘুমিয়ে পড়ে শহীদ। পৃথিবীর কোন ব্যাপারে সে মাথা ঘামায় না। কারও বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই। একমনে বই পড়ে। কখনও কখনও খোলা জানালা পথে ইউক্যালিপটাস গাছের দিকে তাকিয়ে থেকে ঘন্টার পর ঘন্টা কি যেন ভাবে। বাইরে মোটেই বের হয় না শহীদ। কুয়াশা, রাসেল কিংবা মি. সিম্পসন গেলে সে খুশি হয়ে ওঠে। তার চোখ মুখ দেখলে সেটা বুঝা যায়। কিন্তু কথা বড় একটা বলে না সে কারও সাথেই।

কুয়াশা শহীদকে দেখতে গিয়ে রাসেলকে পেয়ে কথায় কথায় গতকাল তার অস্ট্রেলিয়া যাবার পরিকল্পনার কথা বলেছিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করেছিল রাসেল। সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছিল কুয়াশা। কিন্তু তার মূল উদ্দেশ্যের কথা বলেনি সে। সে যে ইউরেনিয়ামের সন্ধানে অস্ট্রেলিয়ায় যাবে তা রাসেল কেন, ড. মূরকোটকেও বলেনি কুয়াশা।

কুয়াশা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল রাসেলকে। বলেছিল, 'যাবে নাকি হে? মহাদেশটা বড় সুন্দর। যেতে চাও বেড়াতে?'

রাসেল কেন যেন গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, 'আপনি তো নিশ্চয়ই কোন না কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছেন। আপনার উদ্দেশ্য না জেনে আপনার সাথে যাওয়া উচিত হবে না। কিন্তু এ-ও সত্যি যে উদ্দেশ্যটা আপনি আমাকে জানাবেন না। ঠিক আছে, আগামী পরশুদিন আমি জানাব আপনাকে।'

কুয়াশা বলেছিল, 'তাই জানিয়ো। আমি পরশুদিন বিকেলেই রওনা হব।'

কিন্তু ঢাকা শহরের কোথাও পাওয়া গেল না রাসেলকে। ডি. কস্টা আধঘন্টা পরই ফিরে এসে জানাল সে হোস্টেলে নেই। বিকেলে সে বেরিয়েছে, তারপর আর ফিরে যায়নি। তার বন্ধু-বান্ধবরা খুব চিন্তা করছে।

কুয়াশা রাসেলের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুর বাড়িতে লোক পাঠাল। কিন্তু তারাও কেউ বলতে পারল না রাসেলের খবর। শেষ অবধি রাসেলের সাভারের বাড়িতে ফোন করল কুয়াশা। কিন্তু আশ্চর্য! রাসেল সেখানেও যায়নি।

মি. সিম্পসনকে ফোনে জানাল কথাটা কুয়াশা। কিন্তু তিনিও কোন হদিস দিতে পারলেন না রাসেলের।

সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ করা হলো। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না রাসেলকে। সে যেন আচমকা বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

রাসেলকে পাওয়া না গেলেও কুয়াশাকে খুব একটা চিন্তিত বলে মনে হলো না। ছেলেটার মাথা খুব ভাল, জানে সে। সেজন্যেই তাকে স্নেহ করে কুয়াশা। কুয়াশা জানে রাসেল যে-কোন বিপদেই পড়ুক না কেন, শেষ পর্যন্ত সে উদ্ধার পাবেই। নিজের ভালমন্দ বুঝে চলবার ক্ষমতা তার আছে। তার জন্যে চিন্তিত হবার কিছু নেই।

পরদিন সকালে আর একবার খোঁজ নেবার চেষ্টা করল কুয়াশা। মি. সিম্পসন জানালেন, 'কোন খবর নেই রাসেলের।'

কুয়াশা বলল, 'দেখা হলে ওকে বলবেন যে আমি অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছি। তার জন্যে অপেক্ষা করার ইচ্ছে থাকলেও উপায় ছিল না।'

মি. সিম্পসন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করে কুয়াশার হঠাৎ অস্ট্রেলিয়া যাবার উদ্দেশ্য কি জানার চেষ্টা করলেন। বাকি সব প্রশ্নেরই উত্তর দিল, শুধু আসল প্রশ্নটার উত্তর এড়িয়ে গেল কুয়াশা।

ভোর রাতের দিকে আবার মেসেজ এসেছিল ড. মূরকোটের। আশ্চর্য মেসেজ। মাত্র তিন ঘণ্টা আগে তিনি যে বিপদগ্রস্ত জানিয়ে মেসেজ পাঠিয়েছেন সে-কথা উল্লেখই করলেন না।

বিপদের কথা উল্লেখমাত্র না করে ড. মূরকোট তাঁর শেষ মেসেজে জানতে চাইলেন কুয়াশার কুশল সংবাদ। তারপর বললেন, সুপারম্যান তৈরি করার জন্যে তিনি গত বিশ বছর ধরে যে গবেষণা চালাচ্ছেন সে ব্যাপারে কুয়াশার পরামর্শ এবং সাহায্য দরকার তাঁর। প্রথম মেসেজে তিনি জানিয়েছিলেন, শীঘ্রি আসুন। কিন্তু দ্বিতীয় মেসেজে সে কথার উল্লেখ না করে জানালেন পনেরো দিনের মধ্যে কুয়াশা যদি অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর সাথে দেখা করে তাহলে তিনি খুশি হবেন। আরও অদ্ভুত কথা বললেন তিনি। বললেন, গত পাঁচ বছর আগে প্যারিসে কুয়াশার সাথে তাঁর লেসার-রে সম্পর্কে যে আলাপ হয়েছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ করবেন দেখা হলে।

অথচ ড. মূরকোটের সাথে গত দশ বছর ধরে দেখা হয়নি কুয়াশার।

ড. মূরকোটের দ্বিতীয় মেসেজ পেয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল কুয়াশা। এর মানে কি? নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন রহস্য আছে।

মাত্র পাঁচ মিনিট পর উজ্জ্বল হয়ে উঠল কুয়াশার চোখ দুটো। বুঝে ফেলেছে সে ড. মূরকোটের মনের কথা। ইচ্ছা করেই উল্টো-পাল্টা কথা বলেছেন তিনি। কুয়াশা যাতে সাবধান হয়ে যায়। তারমানে ড. মূরকোট সত্যি সত্যি বিপদে

পড়েছেন। ড. মূরকোটের প্রথম মেসেজটাই সঠিক। বিপদে পড়েছেন তিনি। কুয়াশার সাহায্য চেয়েছেন তাই।

কিন্তু কুয়াশা সাহায্য করতে গিয়ে যদি নিজে বিপদে জড়িয়ে পড়ে তাহলে বিপদের উপর বিপদ হবে। সেজন্যেই দ্বিতীয় মেসেজে উল্টোপাল্টা কথা বলে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি কুয়াশাকে। তিনি জানেন কুয়াশা বুদ্ধিমান। সে ঠিক তাঁর মনের কথা বুঝতে পারবে।

তিন

যাত্রা হলো শুরু।

প্রায় চার হাজার নটিক্যাল মাইল দূরত্ব অতিক্রম করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে সাদা ধবধবে ইয়ট গাঙচিল, কুয়াশা, ডি. কস্টা এবং একজন ক্যাপ্টেন, দুজন সহকারী ক্যাপ্টেন, কয়েকজন নাবিক, জনাকয়েক বাবুর্চি-বেয়ারা, প্রচুর খাদ্য সম্ভার, কুয়াশার আবিষ্কৃত অদ্ভুত সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নিয়ে পরদিন সকাল আটটায় বঙ্গোপসাগরের শান্ত, সমাহিত জলরাশির উপর দিয়ে হাঁসের মত সাবলীল গতিতে এগিয়ে যেতে শুরু করল।

বেলা ন'টায় ডেকে সভা বসল।

সভার আহ্বায়ক ডি. কস্টা। বক্তাও সে, সভাপতিও সে।

নাবিকের দল এবং সহকারী ক্যাপ্টেনদ্বয় দাঁড়িয়ে রইল ডেকে। বাতাসে কাপড় চোপড় উড়ছে সকলের।

একটি সৌখিন লাঠিতে ভর দিয়ে লম্বা রোগা দেহটা খানিকটা নত করে বলে চলেছে ডি. কস্টা, 'পৃঠিবীর স্মলেস্ট, আই মীন, কন্টিনেন্ট, আই মীন, মহাডেশ হলো অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া হামাডের ডেশ। হামার পূর্ব পুরুষের পূর্বপুরুষ ছিলেন জেমস কুক। হামি টার গ্রেট গ্রেট গ্র্যাণ্ড সনের গ্রেট গ্রেট গ্র্যাণ্ড সন কিংবা…কঠা যাই হউক,– জেমস কুক কে ছিলেন জানেন নিশ্চয়? অস্ট্রেলিয়ার আবিষ্কর্টা। সেভেনটিন সেভেনটিতে টিনি এই মহাডেশ আবিষ্কার করিয়াছিলেন!'

খুক খুক করে কাশল সহকারী ক্যাপ্টেন আলম। কিন্তু ডি. কস্টা সেদিকে কর্ণপাত না করে বলে চলল, 'সায়েন্টিস্টডের ঢারণা হোয়েন আই ওয়াজ–ডুট্টরি ছাই, আঙরেজী টো বুঝবেন না–হাপনাডের লাইফই বরবাড–লেট দ্যাট গো. যেটে ডিন, যা বলিটেছিলাম, সায়েন্টিস্টডের ঢারণা পৃঠিবীটা যখন কোল্ড হয়ে গিয়ে রেস্ট নিচ্ছিল, যখন পৃঠিবীর ফিজিক্যাল চেঞ্জ হবার বিগ ধরনের কোন সম্ভাবনা ছিল না, জাস্ট অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইল।'

ডি. কস্টা সহকারী ক্যাপ্টেনের দিকে হাত বাড়াল, 'সিগারেটের প্যাকেট ফেলিয়া আসিয়াছি কেবিনে–ডিন টো হাপনার একটা।'

সিগারেট ধরিয়ে ডি.কস্টা আবার শুরু করল 'সেই ভূমিকম্পের ফলে ক্রিয়েট

হয় ইণ্ডিয়ান ওশেন, আই মীন, ভারট মহাসাগর। ভারট মহাসাগর অ্যাট দিস মোমেন্ট যেখানে রহিয়াছে সেখানে ছিল না। ভারট মহাসাগর টো ডুরের কঠা, ওয়াটার বলটেই এখানে কিছু ছিল না। ছিল মাটি। রিস্টীর্ণ, বিশাল মাঠ, ফিল্ড। কিন্তু ভূমিকম্প হবার পর সব ওলটপালট হয়ে গেল। বিশাল ভূ-পীস আই মীন ভূ-খণ্ড কাঁপতে কাঁপতে নিচু হটে হটে অড়শ্য হয়ে গেল—যেমন হামার ফ্রেণ্ড হঠাৎ একএক সময় অড়শ্য হয়ে যায়।'

হেসে ফেলল সবাই।

কিন্তু ডি. কস্টা নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত। লাঠির উপর দেহের ভার আরও বেশি করে দিয়ে কোনরকমে দাঁড়িয়ে রইল সে। দাঁড়িয়ে থাকতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে তার কেননা ঢেউ বাড়ার সাথে সাথে ইয়ট দুলছে একটু একটু। ডি. কস্টা অসুস্থবোধ করছে।

'আপনি বরং আপনার কেবিনে গিয়ে বিশ্রাম নিন,' বলল নাবিক শাজাহান, 'সমুদ্রে বোধহয় আগে আসা হয়নি সাহেবের?'

'হোয়াট!' গর্জে উঠল ডি. কস্টা, 'জানো, জন্মের পর থেকে হামি সমুদ্রে! হামাডের বংশের এটা একটা ট্রেডিশন। ভারট মহাসাগরে একা একটা ইয়ট নিয়ে মাসের পর মাস কাটাইয়াছি। জেমস কুক ছিলেন হামাডের রিলেটিভ, টার রক্ত বহিটেছে আমার শরীরে!'

আলমগীর সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'শাজাহানের কথা ধরবেন না, মি. ডি। ও তো আর আপনাকে চেনে না।'

ডি. কস্টা একটু হাসল আলমগীরের দিকে তাকিয়ে। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'ভূ-পীস টো কাঁপতে কাঁপতে নিচু হয়ে গেল। সেই জায়গা দখল করল ওয়াটার। সেই অগাধ ওয়াটার বিরাট এক সমুদ্র হয়ে ডেখা ডিল। যার নাম হলো ভারট মহাসাগর। কিন্টু এশিয়ার সেই বিশাল মাঠ অড়শ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত গেল কোঠায়? সেই ভূ-পীস, আই মীন, ভূ-খণ্ড চার হাজার মাইল দূরে, ট্রপিক অভ ক্যাপ্রিকর্ণের উপর, আই মীন, মকর-ক্রান্তির উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। এই ভূ-খণ্ডই হইল অস্ট্রেলিয়া, হামার স্বজাটিডের মহাডেশ।'

একটু থেমে সকলের মুখের দিকে তাকাল ডি. কস্টা। সবাই মুচকি মুচকি হাসছে। কিন্তু শরীর ভাল ঠেকছে না বলে ওদের সাথে ঝগড়া করার ইচ্ছা ত্যাগ করল সে। সে ভেবেছিল খানিক আগেই স্বয়ং কুয়াশার কাছ থেকে শেখা তথ্যগুলো এদেরকে শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে। কিন্তু এরা কেউ তার জ্ঞানের বহর দেখে অবাক হয়নি বুঝতে পারল সে। সে দুঃখ পেল না। লোকগুলো মূর্খ, তার ধারণা। ওদের জন্যে বরং করুণাই বোধ করল সে।

'আপনি আমাদের সম্মানিত ব্যক্তি,' বলল শাজাহান. 'সমুদ্র ভ্রমণের প্রচুর অভিজ্ঞতা আপনার। আপনার সম্মানে আমরা আজ সন্ধ্যায় একটা পার্টি দিতে

চাই। আপনি স্টোর কিপারকে ভজিয়ে কয়েক বোতল...!'

'অলরাইট। অলরাইট!'

ডি. কস্টা আনন্দে গর্বে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল, 'সে কঠা আপনাকে ভাবটে হবে না। হামি ওয়াইনের ব্যবস্থা করিব।'

হঠাৎ বমি বমি ভাব উঠল ডি. কস্টার। ইয়ট যতই দুলছে ততই সি-সিকনেসের মুঠোয় চলে যাচ্ছে সে।

'হামাকে এখন পড়াশুনা করিটে হইবে,' ডি. কস্টা বলল। 'টাছাড়া হামার ফ্রেণ্ড মি. কুয়াশাকে কিছু বুড্ডি পরামর্শও ডিটে হবে। জানেনই টো. হামার পরামর্শ ছাড়া টার চলে না—চলিলাম ডেকা হবে সন্ধ্যার সময়।'

চলে গেল ডি. কস্টা। পিছন থেকে নিজেদের মধ্যে ডি কস্টার সম্পর্কে আলাপ করতে করতে হোঃ হোঃ হেসে ফেলল ওরা সবাই। কিন্তু ডি. কস্টা ভুলেও পিছন ফিরে তাকাল না। এক সেকেণ্ড সময় নষ্ট করার উপায় নেই তার এখন। বমি প্রায় গলায় এসে ঠেকেছে। দেরি করলে ওদের সামনেই হয়তো বমি করে ফেলবে।

সবাই জেনে ফেলবে সে সমুদ্র ভ্রমণে একেবারে নতুন। সেটা বড় লজ্জার ব্যাপার হবে।

সমুদ্র রুদ্রমূর্তি ধারণ করল বিকেলের পর থেকে। সন্ধে যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল ঢেউয়ের উচ্চতা বাড়তে বাড়তে ছোটখাট এক একটা টিলার সমান হয়ে দাঁড়াল।

চারদিকে অ[illegible] [illegible]াশি। কোথাও কোনদিকে তীরের চিহ্ন নেই। নেই কোন প্রাণের সাড়া। শুধু [illegible] আর জল, ঢেউ আর ঢেউ। ঢেউয়ের মাথায় চড়ে নাচছে গাঙচিল। যেন বিশাল সীমাহীন আকাশে একটি গ্যাস বেলুন উড়ছে।

প্রকাণ্ড লাল সূর্য অস্ত যাচ্ছে পশ্চিম সমুদ্রে। সে তেজ নেই সূর্যের। তাকিয়ে থাকলে ঝলসে যাচ্ছে না চোখ। ঢেউয়ের আড়ালে কখনও হারিয়ে যাচ্ছে অতবড় সূর্যটা কখনও দেখা যাচ্ছে আবার ঢেউ নেমে গেলে।

পুবাকাশে মেঘ। মেঘ মাথার উপর। আকাশের কোথাও একটি পাখি নেই। সারাটা দিনে মাত্র দুটো সি-গাল দেখেছে কুয়াশা।

শক্তিশালী লেন্সের বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে পুবাকাশের কোনায় স্তূপীকৃত কালো মেঘের দিকে তাকাল কুয়াশা। গম্ভীর হয়ে উঠল সে। লক্ষণ ভাল নয়। হাতঘড়ি দেখে পকেট থেকে মিনি ট্র্যানজিসটর সেটটা [illegible]র করে অন করল সে।

নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে বঙ্গোপসাগরে। বাংলাদেশ-রেডিও থেকে খানিক পর পরই সামুদ্রিক যানবাহনগুলোকে নিকটবর্তী বন্দরে আশ্রয় নেবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

ঘাড় ফিরিয়ে কুয়াশা কন্ট্রোলরুমের দিকে তাকাল। ক্যাপ্টেন হাফিজ হাসি মুখে

তাকিয়ে আছে উইণ্ডস্ক্রীনের ওপাশ থেকে কুয়াশার দিকে। কুয়াশা হাত ইশারায় ডাকল তাকে।

ডেকে নেমে এল ক্যাপ্টেন।

কুয়াশা বসল ডেকের উপর একটি চেয়ারে। চেয়ারের সামনে একটি ছোট টেবিল। টেবিলের উপর একটা ম্যাপ। ভারত মহাসাগরের ম্যাপ।

ক্যাপ্টেন সামনে এসে দাঁড়াল।

'কেমন বুঝছেন আবহাওয়া,' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

'ভাল নয়। কি হবে বুঝতে পারছি না, স্যার।'

কুয়াশা ম্যাপের দিকে চোখ রেখে বলল, 'আমরা বঙ্গোপসাগরের শেষ সীমায় চলে এসেছি। সন্ধ্যার পরই ইয়ট পড়বে ভারত মহাসাগরের আওতায়। নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে, এই যে, এখানটায়।' কুয়াশা ম্যাপে আঙুল নির্দেশ করে দেখাল। বলল, 'যদি নিম্নচাপ দক্ষিণ দিকে সরে না আসে তাহলে আমরা নিরাপদ থাকব। তাই না?'

এক গাল হাসি দেখা দিল প্রৌঢ় ক্যাপ্টেনের মুখে। বলল, 'ঠিক তাই, স্যার।'

কুয়াশা বলল, 'সেক্ষেত্রে নিকোবর দ্বীপে ইয়ট নোঙর করার কোন দরকারই নেই। চট্টগ্রাম থেকে আটশো পঁচিশ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণে রয়েছি এখন আমরা। তার মানে নিকোবরের মাত্র কয়েক মাইলের মধ্যে। বিপদ মনে করলে ইয়ট ঘুরিয়ে নিন। তবে সময় নষ্ট করতে চাই না আমি।'

'কোন দরকার নেই, স্যার। আমরা নিরাপদেই এগিয়ে যেতে পারব।'

'বাড়িয়ে দিন স্পীড। টোয়েনটি ফাইভ নট করুন।'

'ইয়েস, স্যার।' দ্রুত চলে গেল ক্যাপ্টেন ডেক ছেড়ে।

ক্যাপ্টেন চলে যাবার খানিক পর এল বেয়ারা কফি নিয়ে। কফির কাপসহ ট্রে টেবিলে রেখে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বেয়ারা। কুয়াশা মুখ তুলে তাকাল ম্যাপ থেকে। বলল, 'ডি. কস্টা কোথায়?'

'তিনি তার কেবিনে, হুজুর। ডেকেছিলাম, ভিতর থেকে বললেন যে কফি দরকার নেই তার। বই-পত্র নিয়ে খুব ব্যস্ত।'

'আচ্ছা, যাও।'

বেয়ারা চলে গেল।

ডি. কস্টাকে কুয়াশাও ডেকেছিল খানিক আগে একবার। দরজা খোলেনি সে। বন্ধ দরজার ভিতর থেকে সে জানিয়েছে, 'প্লীজ, হামাকে ডিসটার্ব করিবেন না, মি. কুয়াশা। স্বজাতিদের দেশ অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে শিক্ষা আহরণ করিটেছি। ভেরি বিজি ইনডিড।' মুচকি হেসে সরে এসেছে কুয়াশা। খানিক পর সে ইয়টের ডাক্তার মল্লিককে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তাকেও পাত্তা দেয়নি ডি. কস্টা।

*

'লেখা পড়া করছে? অসম্ভব!' বলল নাবিক জোয়াবদার, 'ইয়ার্কি মারার জায়গা পায়নি! নিশ্চয়ই আমাদেরকে ফাঁকি দেবার মতলব ওর। স্টোরকিপারের কাছ থেকে হুইস্কি আদায় করতে পারেনি বলে বের হচ্ছে না সে···।'

আলম বলে উঠল, 'উহুঁ, আমার তা মনে হয় না···।'

লাঞ্চ পরিবেশন করার জন্যে আলাদা একটি গ্রুপ আছে বেয়ারাদের। সেই গ্রুপের সাদেক আলী বলল, 'কিন্তু ডি. কস্টা সাহেব যে দুপুর থেকেই দরজা বন্ধ করে রেখেছে। দুপুরে খায়ওনি সে কিছু। লাঞ্চ নিয়ে গিয়েছিলাম। দরজা খুলল না। বলল, কাজে ব্যস্ত, খাওয়াদাওয়ার সময় নেই।'

সহকারী ক্যাপ্টেন বলল, 'সবাই মিলে একবার যাই চলো। রীতিমত সন্দেহজনক ব্যাপার। দেখা দরকার কি কারণে সে দরজা খুলছে না।'

'সে-ও ঠিক। তবে তাই যাওয়া যাক।'

নিচে বসে কথা বলছিল ওরা। সবাই এবার এলিভেটরের দিকে পা বাড়াল উপরে ওঠার উদ্দেশ্যে। ডি. কস্টার কেবিনটা তিন তলাতেই।

এলিভেটর থেকে নেমে প্যাসেজ ধরে হৈ.হৈ করতে করতে ডি. কস্টার কেবিনের দিকে এগিয়ে চলল ওরা। আশপাশ থেকে আরও কয়েকজন ভিড়ল দলে। সবাই একসাথে ডি. কস্টার কেবিনের সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রথমে কলিংবেল টেপা হলো।

ডি. কস্টা কোন সাড়া দিল না ভিতর থেকে। আলম ধাক্কা দিল দরজার গায়ে। তবু কোন সাড়া নেই ডি. কস্টার।

নাম ধরে ডাকাডাকি করল জোয়াবদার। কিন্তু তবু সাড়া পাওয়া গেল না ডি. কস্টার।

'কি করা যায়?' জিজ্ঞেস করল শাজাহান।

'দরজা ভাঙো,' বলল অপর সহকারী ক্যাপ্টেন সামাদ।

'তাছাড়া আর উপায়ই বা কি। তবে মিস্ত্রিকে ডেকে স্ক্রুগুলো খুলে দরজা খোলার ব্যবস্থা করলে হয়।'

শাজাহান ছুটল মিস্ত্রিকে ডাকতে।

তিন মিনিটের মধ্যেই মিস্ত্রি তার যন্ত্রপাতি নিয়ে এল।

দরজা খোলার পর দেখা গেল আশ্চর্য এক দৃশ্য।

সাদা একটি চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে শুয়ে আছে ডি. কস্টা। চাদরের উপরে একটি সাদা কাগজ। বড় বড় অক্ষরে তাতে লেখাঃ হামি সুইসাইড করিটেছি। হাপনারা যখন দরজা ভাঙিয়া এই কেবিনে ইন করিবেন টখন্ আমি হেভেনে চলিয়া যাইব। আমার সুইসাইডের, আই মীন, আত্মহত্যার কারণ আছে। কিন্তু সে-কারণের কঠা হামি বলিয়া যাইটেছি না। আমার ডেডবডি সমুদ্রে যেন না ফেলা হয়।

কোল্ড স্টোরে রাখিয়া ডিটে হইবে। টারপর অস্ট্রেলিয়ায় গিয়া কবরস্থ করিটে হইবে। বিডায়।

কেবিনের চারদিকে বমি। টেবিলে বমি। মেঝেতে বমি। এমনকি ডি. কস্টা যেখানে শুয়ে রয়েছে সেখানেও বমি।

ডি. কস্টার লেখাটা পড়ে অবাক বিস্ময়ে সকলে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। কারও মুখে কোন কথা ফুটল না।

খবর পেয়ে ছুটে এল কুয়াশা এবং ডাক্তার মল্লিক। ডাক্তার মল্লিক সকলকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিল কেবিন থেকে। সবাই যেতে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

কুয়াশা ইতিমধ্যে ডি. কস্টার শরীর থেকে চাদরটা সরিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করেছে। দেড় মিনিট পরই মুচকি একটু হাসল কুয়াশা।

ডাক্তার মল্লিকের দিকে তাকিয়ে কুয়াশা বলল, 'বেঁচে আছে এখনও। তবে বলা যায় না কি হবে। তাড়াতাড়ি পাম্প করে পয়জন বের করার ব্যবস্থা করুন।'

মৃদু হাসি ঠোঁটে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল কুয়াশা।

কুয়াশা বেরিয়ে যেতেই ডাক্তার মল্লিক একটা লম্বা রাবারের পাইপ ব্যাগ থেকে বের করে ডি. কস্টার গালের ভিতর পুরে দেবার কাজে লেগে গেলেন।

কিন্তু গালের ভিতর দিয়ে পেটে পাইপ নামাবার কোন দরকারই হলো না। ডি. কস্টা আচমকা এক ঝটকায় পাইপটা গাল থেকে বের করে ফেলে দিল মেঝেতে। সাথে সাথে বিছানার উপর উঠে বসল সে।

ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে ডি. কস্টা ডাক্তার মল্লিকের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'খবরডার, চিৎকার-টিৎকার করিবেন না, ডক্টর! হামি সুইসাইড করি নাই, আই মীন মৃত্যুবরণ করি নাই। পয়জনও খাই নাই, সট্যি বলিটেছি। কিন্তু কঠাটা যেন কেউ না জানে…।'

'তাহলে এই ধরনের আচরণের কি কারণ বলুন?' ডাক্তার অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'কারণটা টো হাপনাকে বলিবই।' ডি. কস্টা বলল, 'কিন্টু কঠা ডিন হাপনি কাহাকেও বলিবেন না।'

'কথা দিচ্ছি।'

'আসলে সকাল ডশটার পর হইটে হামি বমি করিটে শুরু করি। কারণ জীবনে এই প্রঠম সমুদ্র-ভ্রমণে বাহির হইয়াছি টো, ইয়টের ডোলাটা সহ্য করিটে পারিটেছি না। কিন্তু কথাটা যডি সবাই জানিটে পারে টাহলে আমার প্রেস্টিজ বলিটে কিছু ঠাকে না। টাই যখন ডেখিলাম ডরজা ভাঙিয়া উহারা কেবিনে ইন করিবার চেষ্টা করিটেছে টখন একটি লেটার লিখিলাম বাঢ্য হইয়া। আসলে পয়জন-টয়জন ভক্ষণ করি নাই। খবরডার, কেউ যেন কঠাটা না জানিটে পারে…'

টপ্ ডেকে দাঁড়িয়েছিল ওরা। বাতাসে পত পত করে উড়ছে ওদের প্যান্ট-

শার্ট।
কুয়াশা ডি. কস্টার কেবিন থেকে ডেকে আসতেই উদ্বিগ্ন মুখে সবাই তাকাল।
কুয়াশা বলল, 'চিন্তা করার কিছু নেই। এ যাত্রা বেঁচে যাবে ডি. কস্টা। তবে বেশ ক'দিন অসুস্থ থাকবে সে এখন। বিশ্রাম দরকার। ওকে তোমরা কেউ বিরক্ত কোরো না।'
কুয়াশা বসল একটি ডেক-চেয়ারে।
সবাই ফিরে যেতে উদ্যত হলো।
হঠাৎ চিৎকার করে উঠল শাজাহান? 'আরে! ওটা কি!' সামনে জলরাশির খানিকটা উপরে আঙুল তুলে দেখাল শাজাহান।
সকলে তাকাল সেদিকে।
সন্ধ্যা না নামলেও সূর্য অস্ত গেছে এইমাত্র। চারদিকে ডানা মেলে দিয়েছে মেঘ। আবছা অন্ধকার। তবু সবাই দেখতে পেল জিনিসটা মাত্র পলকের জন্যে।
সমুদ্রের জল থেকে দশ বারো হাত উপরে যখন জিনিসটা তখন সবাই দেখল। শাজাহান আরও কয়েক সেকেণ্ড আগেই দেখেছে অবশ্যি।
সবেগে শূন্য থেকে সমুদ্রের পানিতে পড়ল জিনিসটা। আবছা অন্ধকারে মনে হলো একটি মানুষ।
সকলে তাকাল আকাশের দিকে। আকাশে মেঘ। মেঘ ছাড়া আর কিছু নেই। আকাশ থেকে মানুষ পড়ল এ যেন অবিশ্বাস্য কথা। কিন্তু চোখের দেখা তো ভুল হতে পারে না।
উঠে দাঁড়িয়েছে কুয়াশা ডেক-চেয়ার ছেড়ে। বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে আকাশ দেখছে সে। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না আকাশে।
'ওই যে! ভেসে উঠেছে!' চিৎকার করে উঠল জোয়ারদার।
'মানুষ! মানুষ!' একযোগে চিৎকার করে উঠল বাকি সকলে সবিস্ময়ে।
বিনকিউলার দিয়ে সমুদ্রে তাকাল কুয়াশা। পনেরো সেকেণ্ড পর বিনকিউলার চোখ থেকে নামিয়ে শান্ত গলায় কুয়াশা বলল, 'ইয়ট থামাতে বলো। সিঁড়ি নামিয়ে দাও বোটে ওঠার। ওকে বাঁচাতেই হবে!'
বিনকিউলার দিয়ে কুয়াশা মানুষটাকে দেখেছে। শুধু দেখেইনি, চিনতেও পেরেছে সে।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল কুয়াশা তর তর করে। প্রায় বারো ফুট উপরে থাকতেই লোহার সিঁড়ি থেকে লাফ দিল কুয়াশা।
বোটের উপর গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা শূন্য থেকে। দ্রুত হাতে ইয়টের গা থেকে দড়ির বাঁধন খুলে ফেলল সে।

ইয়টের পাশে ক্ষুদ্র বোটটা প্রকাণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কায় ভীষণভাবে লাফাচ্ছে।

ইয়টের স্পীড কমে গেছে। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছে ক্যাপ্টেন।

বাতাসের দাপটে দাঁড়িয়ে থাকা দায়। ঝটপট খুলে ফেলল কুয়াশা পরনের আলখাল্লা। বৈঠাটা হাতে নিয়ে বসল সে।

সার্চ লাইটের আলো ফেলা হয়েছে জলে। কিন্তু ঢেউয়ের আড়ালে, স্রোতের টানে হারিয়ে গেছে মানুষটা। ইয়টের ডেক থেকে আলো জ্বেলে খোঁজার চেষ্টা করছে সবাই।

ইয়ট থামছে। ইয়টের পিছন দিকে এগিয়ে চলেছে কুয়াশার বোট। স্রোতের টানে অচেতন দেহটা ইয়টকে পাশ কাটিয়ে চলে এসেছে নিশ্চয়ই পিছন দিকে।

দুই মানুষ সমান উঁচু ঢেউয়ের মাথায় চড়ে দুলছে বোটটা। আবার ঢেউ সরে গেলেই নেমে আসছে সেটা নিচে। বোটের দুই পাশে উঁচু উঁচু ঢেউ। একটি ক্রমশ কাছে সরে আসছে পাহাড় সমান উঁচু হয়ে, অপরটি দূরে সরে যাচ্ছে।

ঢেউয়ের মাথায় আবার বোট উঠে যেতেই কুয়াশা দেখতে পেল কালো মত কি একটা ভাসছে দূরে। স্রোতের টানে দূরে সরে যাচ্ছে জিনিসটা।

কুয়াশার বোটও তীব্র বেগে এগিয়ে চলেছে সেদিকে স্রোতের টানে। কিন্তু স্রোতের উপর ভরসা করলে কোন লাভই হবে না। দূরত্ব একই থেকে যাবে। স্রোতের চেয়ে দ্রুত গতি দরকার এখন। কিন্তু ঢেউয়ের জন্যে বৈঠা চালিয়েও গতি বাড়ানো যাচ্ছে না।

আর একবার ঢেউয়ের চূড়ায় বোট উঠলে কুয়াশা দেখল কালো মত জিনিসটা একই দূরত্বে রয়েছে। পিছন ফিরে তাকাল কুয়াশা।

পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইয়ট। হাত নেড়ে ইশারা করল কুয়াশা ক্যাপ্টেনের উদ্দেশ্যে।

স্টার্ট দিল ইয়ট।

কুয়াশা আর দেরি করল না। বোট থেকে লাফ দিয়ে পড়ল সে অথৈ সাগরে।

প্রাণের ঝুঁকিটা ইচ্ছা করেই নিল কুয়াশা। ঝুঁকি না নিলে রাসেলকে বাঁচানো যাবে না—তার ধারণা।

চার

শত সহস্র হিংস্র, প্রতিশোধপরায়ণ রাক্ষস দুটি মানব সন্তানকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলার জন্যে হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ রবে ছুটে আসছে।

দুটি মানব সন্তানের মধ্যে একটি শিশু। অসহায়। অচেতন। রাসেল আকাশ থেকে সাগরে পড়ার আগেই জ্ঞান হারিয়েছে।

অপর সন্তানটি কুয়াশা। এক একটি পাহাড় সমান ঢেউ এক একটি রাক্ষসের মত ছুটে আসছে সাদা ফেনা মাথায় নিয়ে, বিকট গর্জনে চারদিক প্রকম্পিত করে। সেই

সাথে প্রচণ্ড বাতাস। বাতাস না যেন রাক্ষসদের অট্টহাসি।

কিন্তু বড় দামাল মানব সন্তান কুয়াশা। পরাজয় বরণ করা তার ধর্ম নয়। প্রাণপণ শক্তিতে সে শুধু জলের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করারই চেষ্টা করছে না, রাসেলের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবার চেষ্টাও করে চলেছে সে।

স্টার্ট নিয়েছে আবার ইয়ট। দিক পরিবর্তন করে এগিয়ে আসছে সেটা পিছন দিকে।

তীরবেগে সাঁতার কেটে চলেছে কুয়াশা। রাসেলও দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে স্রোতের টানে। কিন্তু স্রোতের চেয়ে কুয়াশার গতি অনেক বেশি। ফলে রাসেলের এবং তার মধ্যবর্তী দূরত্ব কমে আসছে ক্রমশ।

অন্ধকার ঘনীভূত হয়েছে চারদিকে। ইয়ট থেকে সার্চ লাইট ফেলা হয়েছে। রাসেলকে দেখতে পাচ্ছে কুয়াশা। মাত্র দশ পনেরো হাত দূরে সে এখন।

ইয়ট এগিয়ে এসেছে। কুয়াশাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ইয়ট।

দূরত্ব কমে এল। কুয়াশার প্রায় হাতের নাগালের মধ্যে রাসেল। ধরতে গিয়েও ধরতে পারছে না সে রাসেলকে। ঢেউগুলো যেন তামাশা করছে ওদের দুজনকে নিয়ে।

কিন্তু অনমনীয় মনোবলের পরাজয় নেই। শেষ অবধি রাসেলের শার্টের একটি প্রান্ত ধরে ফেলল কুয়াশা।

ইয়টের উপর থেকে সবাই উল্লাসে চিৎকার করে উঠল।

ইয়টের স্টার্ট বন্ধ করে দিল আবার ক্যাপ্টেন। নাবিকরা মোটা দড়ির শেষ প্রান্ত কোমরে বেঁধে নেমে পড়ল সিঁড়ি বেয়ে সাগরে।

কুয়াশা রাসেলকে এক হাত দিয়ে পাঁজরের সাথে সেঁটে ধরে সাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে ইয়টের দিকে।

কুয়াশাকে ঘিরে রাখল নাবিকের দল। ইয়টের গায়ে এসে থামল কুয়াশা। সহকারী ক্যাপ্টেন এবং একজন নাবিক সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে কুয়াশার কাছ থেকে রাসেলের ভার গ্রহণ করল। অপর দুজন নাবিক হাত বাড়িয়ে দিল কুয়াশার দিকে।

মৃদু হাসল কুয়াশা। বলল, 'দরকার নেই। সরো, আমি উঠে যাচ্ছি।'

রাসেলকে সাগরের গ্রাস থেকে উদ্ধার করা হলো। কিন্তু তাকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি চলল সারাটা রাত ধরে।

শূন্য থেকে সাগরে পড়ার ফলে কাঁধের হাড় সরে গেছে রাসেলের। ডান উরুর ত্বক মাংস কেটে গেছে প্রায় আধহাত জায়গা জুড়ে। এছাড়াও পেটে নোনা পানি ঢুকেছে প্রচুর।

ডাক্তার মল্লিককে সহকারী হিসেবে সঙ্গে রেখে রাসেলকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে

ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নিল কুয়াশা নিজেই।

ইয়টের সিক-বেতে কর্মব্যস্ত সময় বয়ে চলল। রাসেলের পেট থেকে পাম্প করে বের করা হলো পানি। কোরামিন দেয়া হলো। দেয়া হলো অক্সিজেন। তবু রাসেলের জ্ঞান ফেরার কোন লক্ষণ নেই।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কুয়াশা রাসেলের মুখের দিকে। অপারেশন টেবিলে শুয়ে আছে রাসেল। পাশে দাঁড়িয়ে কুয়াশা।

রাত শেষ হয়ে গেল।

সকাল আটটায় একটু যেন নড়ে উঠল রাসেলের ঠোঁট। সাফল্যের আনন্দে মৃদু একটু হাসল কুয়াশা। চোখের পাতা কাঁপল রাসেলের।

আবার কুয়াশা মগ্ন হয়ে পড়ল রাসেলকে নিয়ে। জ্ঞান ফিরছে রাসেলের বুঝতে পেরেছে কুয়াশা। জ্ঞান ফেরার লক্ষণ পরিষ্কার হবার সাথে সাথে নতুন কয়েকটি ওষুধের ব্যবস্থা করা দরকার। তার আগে দরকার রাসেলকে আর একবার ভাল করে পরীক্ষা করা।

বেলা ন'টার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ডাক্তার মল্লিকের দিকে তাকাল কুয়াশা।

ঘুমাচ্ছে রাসেল।

'আর কোন বিপদ নেই। বেঁচে গেল দামাল ছেলেটা এ যাত্রা।'

ডাক্তার মল্লিককে রাসেলের দায়িত্ব দিয়ে সিক-বে থেকে বেরিয়ে গেল কুয়াশা।

'আপনি মহৎ লোক তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

সেদিন সন্ধ্যায় একটি কেবিনের বিছানায় শুয়ে শুয়ে কৃতজ্ঞ কণ্ঠে রাসেল বলল, 'তা না হলে, আমি আপনাকে পছন্দ করি না, আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করি সব সময় জেনেও কেন আমাকে বাঁচালেন!'

স্নেহের হাসি কুয়াশার চোখে মুখে। সে বলল, 'মহৎ আমি নই, রাসেল। সাধারণ একজন মানুষ। মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি আমার দায়িত্ব আছে। সব মানুষেরই আছে। অনেক মানুষ আছে যারা নিজ দায়িত্ব পালন করতে উদ্যোগী হয় না। সে-সব মানুষের চেয়ে আমি খুব একটা শক্তিশালী নই। তারা উদ্যোগী নয়, আমি উদ্যোগী। আমি আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষের কল্যাণ করতে চাই। মানুষের কষ্ট দূর করতে চাই। এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার, এর মধ্যে মহত্ত্ব কোথায়, বলো?'

'আপনি মহৎ বলেই নিজেকে মহৎ বলে স্বীকার করেন না,' রাসেল বলল। 'যাই হোক, আমি আপনার এ ঋণ এ জীবনে হয়তো শোধ করতে পারব না।'

'বাদ দাও, ভাই, ওসব কথা।' কুয়াশা রাসেলের কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'কেমন বোধ করছ এখন? সন্ধ্যায় ডেকে গিয়ে বসতে পারবে তো?'

কুয়াশার দেয়া হাত ঘড়ি দেখল রাসেল। বিকেল পাঁচটা।

'পারব। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'করো। কি কথা?'

'আপনি বলেছিলেন যে অস্ট্রেলিয়ায় এমনি বেড়াতে যাচ্ছেন। কথাটা কি সত্যি?'

কুয়াশা গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'না, সত্যি নয়। আমি অস্ট্রেলিয়ায় যাবার প্ল্যান করেছিলাম বিশেষ একটি প্রয়োজনীয় জিনিসের খোঁজে।'

'কি সেই জিনিস? আমি কি তার নাম জানতে পারি?'

'পারো। ইউরেনিয়াম।'

'ইউরেনিয়াম!' চমকে উঠে বিছানার উপর বসে পড়ল রাসেল। 'ইউরেনিয়ামের খোঁজে যাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ায়? কেন, কি দরকার আপনার ইউরেনিয়াম? হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করতে লাগে ইউরেনিয়াম, মাই গড, আপনি কি আণবিক শক্তির অধিকারী হতে চান? তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় কার কাছে পাবেন ইউরেনিয়াম?'

'উত্তেজিত হয়ো না, রাসেল।' নরম স্বরে বলল কুয়াশা, 'উত্তেজিত হওয়া তোমার উচিত নয় এখন। বিশ্রাম নাও, পরে তোমাকে সব বলব।'

উঠে দাঁড়াল কুয়াশা রাসেলের বিছানার পাশ থেকে।

'না।' খপ্ করে দুর্বল হাতে কুয়াশার একটি হাত ধরে ফেলল রাসেল, 'এখুনি সব বলতে হবে আপনাকে।'

আবার বসল কুয়াশা। বলল, 'পরে ধীরেসুস্থে শুনলেও পারতে। শোনো রাসেল, ইউরেনিয়াম আমার দরকার। বিশ্বাস করো, খারাপ কোন উদ্দেশ্য আমার নেই। মানুষের কল্যাণ ছাড়া আমি আর কিছু ভাবি না। মানুষের দুঃখ কষ্ট সইতে পারি না বলেই বিজ্ঞানের পূজারী আমি। আমি বিশ্বাস করি বিজ্ঞানই একমাত্র পারে মানুষের সব দুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটাতে। প্রতি বছর কয়েক লক্ষ করে মানুষ মারা যাচ্ছে বাংলাদেশে টর্নেডোতে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্যে দরকার আমার আণবিক শক্তি। আণবিক শক্তি তৈরি করতে হলে ইউরেনিয়াম দরকার। অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ভিক্টোরিয়া ডেজার্টে ইউরেনিয়াম আছে। তাই যাচ্ছি। তবে আরও একটি কারণ আছে?'

'কি কারণ?'

'আমার এক বৃদ্ধ বন্ধু আছে ওখানে। ভদ্রলোকও বিজ্ঞানী। বিপদের কথা জানিয়ে মেসেজ পাঠিয়েছেন তিনি। তাকে বিপদমুক্ত করতে হবে। সেজন্যই একদিন আগে রওয়ানা হতে বাধ্য হয়েছি।'

'কি বিপদে পড়েছেন আপনার বন্ধু?'

কুয়াশা বলল, 'জানি না।'

কুয়াশা তারপর মঁসিয়ে মূরকোটের মেসেজ পাঠাবার রহস্যময় ঘটনাটা বর্ণনা করল।

রাসেল কয়েক মুহূর্ত পর হঠাৎ বলল, 'কিন্তু একটি কথা আপনি বেমালুম চেপে যাচ্ছেন, কেন বলুন তো।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল কুয়াশা। বলল, 'কি কথা?'

'আপনি জানেন না? আপনাকে একদল লোক অনুসরণ করছে চব্বিশ ঘণ্টা?'

'তার মানে?' বেশ অবাক হয়েই বলল কুয়াশা।

রাসেল বলল, 'হ্যাঁ। একদল বিদেশী লোক চব্বিশ ঘণ্টা অনুসরণ করছে আপনার ইয়টকে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল কুয়াশা রাসেলের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'স্পেস-ক্রাফট ধরনের আকাশ যানে চড়ে অনুসরণ করছে ওরা তাই না?'

'আপনি জানেন কিভাবে? আপনার তো জানার কথা নয়!' রহস্যময় হাসি হাসল রাসেল।

কুয়াশা বলল, 'লোকগুলোকে আমি রাস্তায় কাবু করে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম। গাড়ির ভিতর থেকে পালিয়ে গেছে তারা। জানলাম কিভাবে জিজ্ঞেস করছ? আমি ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখেছিলাম।'

সপ্রশংসদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাসেল কুয়াশার দিকে। বলল, 'ঘোড়ার পায়ের ছাপ পরীক্ষা করেই ব্যাপারটা কি বুঝতে পেরেছিলেন?'

'খুব সহজ ব্যাপার,' কুয়াশা বলল, 'একটি ঘোড়ার চারটে পা। দাগ দেখেছি মাত্র চারটেই। অথচ ঘোড়া হেঁটে আসলে চারটের চেয়ে বেশি দাগ থাকতে বাধ্য। তা ছিল না। ছিল না বলেই বুঝতে পারলাম যে ওটা আসলে সাধারণ ঘোড়া নয়—পক্ষীরাজ ঘোড়া।'

হেসে উঠল রাসেল। বলল, 'হ্যাঁ, পক্ষীরাজ ঘোড়া। যাকগে, ওরা কারা? কেন অনুসরণ করছে আপনাকে?'

'জানি না, বিশ্বাস করো। তবে ড. মূরকোটের বিপদের সাথে ওদের কোন যোগ থাকতে পারে।' কুয়াশা বলল, 'আচ্ছা, তুমি পক্ষীরাজে চড়লে কখন? পড়লেই বা কেন সাগরে?'

'চড়েছিলাম আপনার বাড়ি থেকে। হ্যাঁ, আপনি যখন লোকগুলোকে গাড়িতে রেখে বাড়ির ভিতর ঢুকলেন তখন আমি আপনার বাগানে লুকিয়ে ছিলাম। আপনি চলে গেলেন। তারপর, অবিশ্বাস্য হলেও দেখলাম, একটি পক্ষীরাজ ঘোড়া বাগানে নামল। গাড়ির ভিতর থেকে অজ্ঞান লোকগুলোকে উদ্ধার করে ফেলল পক্ষীরাজের

আরোহীরা। আমি আর চেপে রাখতে পারলাম না কৌতূহল। পঙ্খীরাজ উড়তে শুরু করার পরমুহূর্তেই আমি তার লেজ ধরলাম দুই হাত দিয়ে মুঠো করে। পঙ্খীরাজ ঘোড়া উড়ে চলল আমাকে নিয়ে।'

'তারপর? পড়লে কেন?'

'পড়লাম কেন? শত্রুদলকে হটিয়ে দিয়ে পঙ্খীরাজের মালিক হবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। ওরা সংখ্যায় বেশি। সবাই মিলে ধরে ফেলে দিল আমাকে। ভাগ্য ভাল, পড়লাম আপনার ইয়টের সামনে। আপনারা যদি দেখতে না পেতেন তাহলে এতক্ষণ কোন এক হাঙর হজম করে ফেলত আমাকে।

হঠাৎ কেবিনের দরজায় টোকা পড়ল।

'কে?' গম্ভীর গলায় জানতে চাইল কুয়াশা।

'মি. স্যানন ডি. কস্টা। মে আই কাম ইন স্যার।'

'আসুন।'

ডি. কস্টা আজ দুপুরে খানিকটা সুস্থ হয়েছে। সুস্থ হয়েই খবর পেয়েছে সে। আলমই তাকে জানিয়েছে যে আকাশ থেকে একটি যুবক পানিতে পরে ডুবে যাচ্ছিল, কুয়াশা তাকে উদ্ধার করেছে।

কেবিনের দরজা ঠেলে ছড়ি ঠুকে ঠুকে ভিতরে প্রবেশ করল ডি. কস্টা। রাসেলকে দেখে হাঁ হয়ে গেল তার মুখটা।

'ইউ? দ্যাট ভেরি চাইল্ড!'

হেসে ফেলল রাসেল। বলল, 'খুব অবাক হয়েছেন মনে হচ্ছে?'

ডি. কস্টা বলল, 'হাপনি নাকি স্কাই ঠেকে সমুদ্রে পড়িয়াছেন? ইজ দ্যাট এ ফ্যাক্ট?'

'কে বলল আপনাকে?'

'সব্বাই বলিটেছে।'

'মিথ্যে বলছে না তারা,' রাসেল বলল।

'আলবত্ মিঠ্যা বলিটেছে। চালাকী করিবার স্থান পান নাই! হামি বলিটে পারি আসল ব্যাপারটা কি ঘটিয়াছে! হাপনি হামাডের ইয়টে লুকাইয়া ছিলেন, তারপর ওয়াটারে লাফ ডিয়া পড়িয়াছেন, বোকা বানাইবার জন্য হাপনি…।'

রেগে উঠল ডি. কস্টা। আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল সে। যেতে যেতে বলতে লাগল, 'নাম্বার ওয়ান লায়ার। মিঠ্যা কঠা বলিয়া আর যাহাকেই ঠকাও, কিন্টু মি. স্যানন ডি. কস্টাকে ঠকাইটে পারিবে না, সে নেটিভ নয়, ফর গড্স সেক…!'

দাঁড়িয়ে আছে সবাই অধীর আগ্রহে ইয়টের ডেকে। সকলের চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

সমুদ্রের কূল নেই, কিনারা নেই।

বিষুবরেখা পেরিয়ে এসেছে ওরা গত পরশুদিন।

গতকাল সকালে কোকোস্ আইল্যাণ্ড এবং ক্রিস্টমাস আইল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী জলপথ অতিক্রম করেছে ইয়ট।

কোকোস্ অস্ট্রেলিয়ানদের দ্বীপ। ক্রিস্টমাস ব্রিটিশদের। দুটো দ্বীপের মাঝখান দিয়ে ইয়ট এলেও তীরের চিহ্ন ওরা কেউ দেখেনি। দুটো দ্বীপের মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রায় সাড়ে পাঁচশো মাইল। মাঝখান দিয়ে ইয়ট গেছে। তীর দেখতে পাবার কথা নয়।

ভারত মহাসাগরের সব চেয়ে গভীরতম এলাকা কোকোস্ কীলিং বেসিন পেরিয়ে এসেছে গাঙচিল গতকালই। এই বিশেষ জায়গায় সমুদ্র অত্যন্ত গভীর। আঠারো হাজার ফুট নিচে মাটি।

অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র সীমায় পৌঁছে গেছে গাঙচিল। উত্তর বা পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া যদি গন্তব্যস্থান হত তাহলে এতক্ষণ তীর দেখতে পেত ওরা।

কিন্তু গাঙচিল নোঙর ফেলবে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায়। তাই কনিষ্ঠতম মহাদেশের পশ্চিমাংশকে পাশ কাটিয়ে, কারনায়ভন, গেরাল্ডটন বন্দরদ্বয়কে হাতের বাঁ দিকে রেখে এগিয়ে এসেছে গাঙচিল।

ইয়ট মোড় নিয়েছে। মোড় নিয়ে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র সীমায় প্রবেশ করেছে। আজ দুপুরের আগে গ্রেট অস্ট্রেলিয়ান বাইটে পৌঁছে যাবে ইয়ট।

বেলা এগারোটা বাজে।

তীর এখনও দেখা যাচ্ছে না, তবে দেখা যাবে যে-কোন মুহূর্তে! ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে খবর শুনে সবাই ডেকে এসে দাঁড়িয়েছে। তীর দেখার উদগ্র বাসনায় সবাই অস্থির হয়ে পড়েছে।

কন্ট্রোলরূমে ক্যাপ্টেনের দুই পাশে বসে আছে কুয়াশা এবং রাসেল।

বিনকিউলার দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। ডেকে যারা আছে তারা তীর দেখতে না পেলেও কন্ট্রোলরূমের ওরা তিনজন বিনকিউলারের সাহায্যে দেখতে পাচ্ছে নূলারবর প্লেনের গভীর বনভূমির অস্পষ্ট চিহ্ন।

'ডেকে ডি. কস্টাকে দেখছি না যে?' ডেকের দিকে অপেক্ষারত লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল রাসেল।

কুয়াশা বলল, 'বেচারা ইয়ট জার্নিতে একেবারে অনভ্যস্ত। বেলা বারোটা অবধি মাথা ঘোরে, বমি হয়। লাঞ্চের আগে কেবিন থেকে বের হয় না।'

কিন্তু ঠিক সেই সময়, কুয়াশা যখন ডি. কস্টা সম্পর্কে বলছিল রাসেলকে, একজন বেয়ারা প্যাসেজ দিয়ে যাবার সময় ডি. কস্টার কেবিনের দরজায় টোকা দিচ্ছিল।

ভিতর থেকে কোন সাড়া না পেয়ে বেয়ারাটি ডাকল, 'মি. ডি. কস্টা?'

তবু কোন সাড়া নেই।

বেয়ারা ধাক্কা দিল দরজার গায়ে।

খুলে গেল দরজা। দরজা ভিতর থেকে খোলা দেখে অবাকই হলো বেয়ারা।

খোলা দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে কেবিনের ভিতরে তাকাল সে।

কেউ নেই কেবিনে।

বেয়ারা ভাবল ডি. কস্টা বেরিয়ে গেছে কেবিন থেকে।

আধ ঘণ্টা পর ডেকে আনন্দে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল সবাই। তীর দেখতে পেয়েছে সবাই।

হৈ-চৈ-এর শব্দ পেয়ে সেই বেয়ারাটি ডেকে উঠে এল। সকলের সাথে সে-ও দেখল তীরভূমির সরলরেখা। তারপর কি মনে করে আশপাশে তাকাল সে।

'ডি. কস্টা সাহেব কোথায় গেলেন?' পাশের একজন বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করল সে।

'তিনি এখনও ঘুমাচ্ছেন।'

'না তো! খানিক আগে আমি তার কেবিন থেকে ফিরে এলাম! নেই কেবিনে।'

এক কান থেকে অনেক কানে কথাটা গেল। ডি. কস্টা কেবিনে নেই। অথচ ডেকেও নেই সে। গেল কোথায়?

খোঁজ পড়ল।

কিন্তু খোঁজাখুঁজিই সার। ইয়টের কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না ডি. কস্টাকে।

বেলা দুটো অবধি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো। এমনকি কুয়াশা স্বয়ং এবং রাসেলও ইয়টের সর্বত্র সন্ধান চালাল। কিন্তু কোথাও তার ছায়ারও দেখা পাওয়া গেল না।

গম্ভীরভাবে কুয়াশা শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করল, 'ইয়টে নেই।'

'গেল কোথায়?' উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করল রাসেল।

কুয়াশা বলল, 'সমুদ্রে পড়ে গেছে কিনা কে জানে। রাতের বেলা, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে একবার করে ডেকে উঠে আসত।'

'কেন?'

'সারাদিন বমি করত আর রাতে সবাইকে লুকিয়ে চাদর, বালিশের কভার ইত্যাদি পানিতে ফেলার জন্যে ডেকে আসত। একদিন আমি দেখে ফেলেছিলাম। হয়তো গতরাতেও তাই এসেছিল। রোগা মানুষ, হয়তো বাতাসের ঝাপটা খেয়ে রেলিং টপকে পড়ে গেছে...।'

কুয়াশার অনুমানটা অনেকাংশে সত্য।

গতরাতে ডি. কস্টা বমিসিক্ত চাদর এবং বালিশের কভার সমুদ্রে ফেলার জন্যে সকলের অগোচরে উঠে এসেছিল ডেকে। সমুদ্রে সে ফেলেও ছিল জিনিসগুলো। তারপর ডেক অতিক্রম করার সময় হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ে আকাশের দিকে।

আকাশের দিকে দৃষ্টি পড়তেই অবিশ্বাসে চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে যায় ডি. কস্টার। প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে ওঠে সে, 'ও মাই গড!'

কিন্তু ডি. কস্টার চিৎকার কারও কানে ঢোকেনি। গতরাতে বাতাসের দাপট ছিল। ফলে সেই সাথে ছিল সমুদ্রের একটানা গর্জন।

কেউ শোনেনি ডি. কস্টার আতঙ্কিত চিৎকার। কারও কানে যায়নি তার সাহায্যের ব্যাকুল আবেদন।

পাঁচ

ইউক্লা বন্দর থেকে আড়াইশো মাইল পুবে নোঙর ফেলল গাঙচিল।

নির্জন তীরভূমি। বালুকাবেলার পর গভীর জঙ্গল। আড়াইশো মাইলের মধ্যে সভ্যতার কোন চিহ্ন নেই। জঙ্গলে বাস করে জংলীরা।

অস্ট্রেলিয়ার জংলীরা পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশের সব জংলীদের চেয়ে অনেক বেশি প্রাচীন, কোন কোন উপজাতি অনেক বেশি অসভ্য। সভ্যতার আলো এখনও পায়নি তারা। এখনও তারা নরমাংস ভক্ষণ করে। উলঙ্গ থাকে। আদিম যুগের মানুষের মত তারা বন্য পশু শিকার করে কাঁচা মাংস খায়। অস্ত্র বলতে তারা ব্যবহার করে একমাত্র বুমেরাংকে। এই অস্ত্রই তাদের একমাত্র সম্বল। বুমেরাং দিয়েই তারা খাদ্য সংগ্রহ করে, এটা ব্যবহার করেই তারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করে।

মাত্র সতেরোশো সত্তর সালে জেমস কুক আবিষ্কার করেন এই মহাদেশ। তার আগে সভ্য মানুষ এই মহাদেশ সম্পর্কে কিছুই জানত না। অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কৃত হবার পর শ্বেতাঙ্গরা ভাগ্যান্বেষণে এই সম্পদশালী মহাদেশে এসে ভিড় জমাতে থাকে।

উনত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার বর্গ মাইলে বাস করে মাত্র এক কোটির মত লোক। প্রতি বর্গ মাইলে মাত্র তিনজন বাস করে। প্রায় নির্জন মহাদেশ।

সোনার প্রায় পনেরোটি খনি আছে এখানে। জংলীরা পর্যন্ত পাঁচ-সের দশ-সের ওজনের সোনার তোড়া পায়ে পরে থাকে। এই সোনার লোভেই শ্বেতাঙ্গরা ভীড় জমিয়েছিল এখানে।

ল্যাণ্ড অভ দ্য গোল্ডেন ফ্লীজ বলা হয় অস্ট্রেলিয়াকে। লক্ষ লক্ষ ভেড়া বাস করে এখানে। পৃথিবীর অধিকাংশ উল পাওয়া যায় এখান থেকেই।

এখন প্রায় আড়াইটা বাজে।

কুয়াশা তৈরি হয়ে নিতে বলল রাসেলকে। ড. মূরকোট বিপদগ্রস্ত। তাঁকে সাহায্য করাটাই সবচেয়ে আগের কাজ। কাল সকাল অবধি অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। জঙ্গলে প্রবেশ করলে আজ সন্ধ্যার আগেই বিশ মাইল অতিক্রম করা যাবে। রাতটা জঙ্গলে কাটিয়ে আগামীকাল সকালের দিকে ড. মূরকোটের আস্তানায়

পৌঁছানো সম্ভব।

অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হলো ওরা।

কুয়াশা এবং রাসেল ছাড়া বাকি সবাই থাকবে ইয়টেই।

ডি. কস্টার জন্যে মন খারাপ সকলের। এই কদিনেই সকলে ভালবেসে ফেলেছিল লোকটাকে। গর্বিত ছিল সে। কিন্তু সকলের দুঃখ বুঝত। ভাল গল্প করতে পারত। তার গল্প বলার ভঙ্গি দেখে হেসে গড়াগড়ি যেত সবাই। সেই লোক সমুদ্রে ডুবে মারা গেছে জেনে সবাই হতভম্ব, স্তম্ভিত। তাই কুয়াশা এবং রাসেলকে যখন সবাই বিদায় দিল তখন কারও মুখে কোন কথা ফুটল না। সবাই ভাবছিল ডি.কস্টার কথা। ডি. কস্টা সবাইকে বলেছিল তীরে নামার আগে সকলকে সে ডিনার খাওয়াবে।

কিন্তু কে জানত তীরে নামার ভাগ্য করে আসেনি বেচারা।

কুয়াশার কাঁধে একটি লেসার গান। অপর কাঁধে ঝুলছে একটি চামড়ার ব্যাগ। তাকে কিছু খাবার, টর্চ, ওষুধপত্র, পানির ফ্লাস্ক, মিনি ওয়্যারলেস সেট একটা।

রাসেলের কাঁধে লেসার গানের বদলে একটা রাইফেল ঝুলছে। তার অপর কাঁধেও একটা চামড়ার ব্যাগ।

বালুকাবেলার উপর দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। গভীর জঙ্গল সামনে।

জঙ্গলের ধারে এসে পিছন ফিরে তাকাল ওরা দুজনেই।

দেখা যাচ্ছে গাঙচিলকে। গাঙচিলের ডেকে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণভাবে হাত নাড়ছে সবাই। রাসেল ভাবল, আবার ফিরতে পারবে তো তারা ইয়টে?

রাসেল হাত নেড়ে উত্তর দিল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে নিল। দেখল কুয়াশা জঙ্গলে প্রবেশ করেছে।

দ্রুত পা চালাল রাসেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা।

অচেনা গভীর বনভূমির ভিতর দিয়ে পথ চলা বড় কষ্টকর। দু'চার পা এগিয়েই থামতে হয়। কাঁটা গাছের কাঁটায় আটকে যায় শার্ট-প্যান্ট। এঁকেবেঁকে গাছের পাশ দিয়ে, উঁচু ঝোপ এড়িয়ে হাঁটতে হয়। সদা-সতর্ক চোখ মেলে রাখতে হয় সামনে পিছনে ডানে বাঁয়ে।

অজানা জঙ্গল। প্রতি পদে বিপদের ভয়।

পরিচিত জঙ্গলে হাঁটা অনেক সহজ। জন্তু জানোয়ারদের চলাচলের পথ পাওয়া গেলে বেশ দ্রুত এগিয়ে যাওয়া যায়। মিনিট দশেক পর কুয়াশা বলল, 'এভাবে এগোলে দেরি হয়ে যাবে অনেক। দুজন বরং আলাদা হয়ে যাই। তুমি ডান দিকে সরে গিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে থাকো। আমি বাঁ দিকে সরে গিয়ে হাঁটতে থাকি। জন্তুদের পায়ে চলা পথ পেয়েও যেতে পারি দু'জনের একজন। মাঝে মাঝে সাড়া দিয়ো। তা না হলে হারিয়ে ফেলব পরস্পরকে।'

তাই হলো। আলাদা হয়ে গেল ওরা দুজন।

একা হাঁটতে হাঁটতে রাসেল ভাবছিল, অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে এমন সব রহস্যময় জীব-জানোয়ার বাস করে যা দুনিয়ার আর কোথাও নেই। প্রাচীন পৃথিবীর সব জায়গা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় নাকি এখনও কোন কোন প্রাচীন জীব-জানোয়ার দেখা যায়।

ঘণ্টাখানেক পর পঞ্চমবারের মত হুইসেল বাজাল রাসেল।

বেশ খানিকটা দূর থেকে কুয়াশা হুইসেল বাজিয়ে সাড়া দিল।

আবার এগিয়ে চলল রাসেল। এক ঘণ্টার উপর হাঁটছে তাঁরা। অথচ জন্তুরা যাতায়াত করে এমন একটি পথও ওদের চোখে পড়ল না।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে চারদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছে রাসেল। বেশিরভাগ ইউক্যালিপটাস গাছ। গামট্রিও অসংখ্য। জাররা গাছও আছে, সংখ্যা খুব কম। জাররা গাছের ছবি দেখেছে আগে রাসেল, কাঠও দেখেছে কিন্তু গাছগুলোকে স্বচক্ষে এই প্রথম দেখল।

দেশের রেললাইনের উপর আড়াআড়িভাবে যে কাঠগুলো ফেলা থাকে সেগুলোর বেশিরভাগই অস্ট্রেলিয়ার জাররা গাছের কাঠ। বড় মজবুত হয় এই গাছের কাঠ। তাছাড়া পিঁপড়ে উই বা অন্যান্য পোকা-মাকড় এই গাছের কাঠের কোন অনিষ্ট করতে পারে না।

ঝোপগুলো যেমন উঁচু তেমনি গভীর। নাম না জানা বুনো ফুল ফুটে রয়েছে ঝোপগুলোর মাথায়।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রাসেল।

এক সেকেণ্ড সময় লাগল রাসেলের সতর্ক হতে। সামনের ঝোপটা নড়ছে।

বিদ্যুৎবেগে কাঁধ থেকে রাইফেলটা নামিয়ে সেফটি ক্যাচ সরিয়ে ঝোপের দিকে তাক করে ধরল সে।

ধীরে ধীরে স্থির হয়ে গেল ঝোপটা।

বোকার মত ঝোপটার দিকে তাকিয়ে রইল রাসেল। রহস্যটা কোথায়?

ঝোপটা নড়ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাতাসে যে নড়ছিল না তাও বুঝতে পারছিল সে।

অপেক্ষা করা দরকার। তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে রইল রাসেল। ঝোপের ভিতর বা অপর পাশে নিশ্চয়ই কিছু আছে। নেকড়ে-টেকড়ে নয়ত?

হায়েনা?

প্রচুর হায়েনা আছে অস্ট্রেলিয়ায়।

ঈমু হওয়াও বিচিত্র নয়। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পাখি ঈমু। পাখি, কিন্তু উড়তে পারে না। আরও অনেক মজার ব্যাপার আছে ঈমু সম্পর্কে। কিন্তু সে যাই হোক, রাসেল ভাবল, ঝোপটা আর নড়ছে না কেন? হুইসেল বাজালে কেমন হয়?

হুইসেল বাজাবার কথা মনে ভাবতেই আবার দুলে উঠল ঝোপটা।

বেশ খানিকক্ষণ ধরে দুলল বড়সড় ঝোপটা। কিন্তু কেউ বেরিয়ে এল না ভিতর থেকে।

ধীরে ধীরে পা বাড়াল রাসেল। মাত্র দশ হাত দূরে ঝোপটা। জিনিসটা কি না দেখে গুলি করা যায় না। হয়তো ঝোপের ভিতর বা অপর পাশে বিশ্রাম নিচ্ছে একটি ঈমু। সেক্ষেত্রে গুলি করাটা হবে নিতান্ত বোকামি। কারণ ঈমু পেলে ধরার চেষ্টা করবে সে।

ঝোপের প্রায় কাছে পৌঁছে গেছে রাসেল। ভিতরে কিছু আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। ভিতরে হয়তো কিছু নেই। আছে অপর পাশে।

ঝোপটা ঘুরে অপর পাশে যাবার জন্যে পা চালাল রাসেল। রাইফেল উঁচিয়ে ধরে রেখেছে সে ঝোপের দিকে প্রথম থেকেই।

ঝোপের অপর পাশে গিয়ে দাঁড়াল রাসেল। দম বন্ধ হয়ে গেল তার। পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে ঝোপটার দিকে।

হঠাৎ বাঁ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নিজের চোখ দুটো কচলাল রাসেল। না, ভুল দেখছে না সে।

চিমটি কাটল রাসেল নিজের শরীরে। ব্যথা লাগে। না, স্বপ্নও দেখছে না সে।

কিন্তু এ দৃশ্য সত্য হলেও অবিশ্বাস্য। রূপকথার অপূর্ব সুন্দরী রাজকুমারী গহীন বনের ভিতর শুয়ে ঘুমাচ্ছে যেন।

মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঝোপের পাশে, লম্বা ঘাসের উপর শুয়ে রয়েছে সে।

পরনে মেয়েটির কোন পোশাক নেই অথচ মেয়েটি জংলীও নয়। শ্বেতাঙ্গ। ধবধব করছে গায়ের রঙ। খুব বেশি বয়স নয় মেয়েটির। বড় জোর ষোলো বছর হবে। ঝোপের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রয়েছে সে। দেখা যাচ্ছে না তাই মুখটা।

খুক করে কাশল রাসেল।

রাসেলের কাশির শব্দ কানে যাওয়া মাত্র মেয়েটি একলাফে উঠে দাঁড়াল।

রাসেলকে রাইফেল বাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লজ্জায় বিস্ময়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল সে। দুই হাত দিয়ে কোনরকমে নিজের লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করে মেয়েটি পালাবার পথ খুঁজতে লাগল চঞ্চল দৃষ্টিতে।

হাতের রাইফেল মাটিতে ফেলে দিল রাসেল। ব্যাগটাও নামাল সে। নিজের শার্টটা খুলে ফেলল আস্তে আস্তে।

মেয়েটির দিকে শার্টটা ছুঁড়ে দিয়ে রাসেল ইংরেজিতে বলল, 'এটা পরে নাও।'

শার্টটা পেয়ে যেন স্বর্গ পেল মেয়েটি। ঝটপট পরে নিল সে রাসেলের শার্ট। গায়ে অতিরিক্ত লম্বা হলো। উরু দুটো প্রায় ঢেকে ফেলল শার্টটা।

'আপনিই মি. কুয়াশা, তাই না?' রাসেলের দিকে উজ্জ্বল, চকচকে দৃষ্টিতে

তাকিয়ে প্রশ্ন করল মেয়েটি, 'আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।'

রাসেল অবাক হলো। বলল, 'কিন্তু তোমার পরিচয় কি? তুমি জানলে কিভাবে যে কুয়াশা এখানে আসছে?'

'মঁসিয়ে মূরকোট আমার বাবা। আমার নাম জোশন ফোম। বাবা আমাকে বলেছিলেন আপনি এই পথ দিয়ে আসবেন, তাই আমি পালিয়ে এসেছি শত্রুদের হাত থেকে।'

রাসেল বলল, 'আমি কুয়াশা নই। তবে আশপাশেই কুয়াশা আছে। ডাকব?'

'তুমি কুয়াশা নও?' হতাশা যেন ছায়া ফেলল জোশন ফোমের চোখে। মনের ভাবটা যেন এইরকম, রাসেল কুয়াশা হলেই ভাল হত।

বাতাসে উড়ছে জোশন ফোমের শার্ট। শার্টের প্রান্ত ধরে সোজা রাখার চেষ্টা করছে সে।

রাসেল হুইসেল বের করে পরপর তিনবার বাজাল।

দূর থেকে কুয়াশার হুইসেলের শব্দ ভেসে এল।

'তুমি কুয়াশা নও, তবে তুমি কে?' রাসেলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ প্রশ্ন করল জোশন ফোম।

'কুয়াশার দেশেরই ছেলে আমি। ছাত্র। আমার নাম রাসেল।'

'তুমি কুয়াশার সাথে এই বিপদের জায়গায় এসেছ কেন? তুমি জানো এখানে এলে এখান থেকে ফিরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব?'

হেসে ফেলল রাসেল। বলল, 'জানলেই কি, না জানলেই কি। বিপদের মধ্যে পড়বার একটা নেশা আছে আমার।'

'অ্যাডভেঞ্চার খুব ভালবাস বুঝি?' সকৌতুকে প্রশ্ন করল ফোম, 'তোমার হবি কি?'

'দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়েদের সাথে পরিচিত হওয়া আমার হবি। পাহাড়ে চড়তে ভালবাসি। জঙ্গলে রাত কাটাতে, শিকার করতে ভালবাসি। সমুদ্রে সাঁতার কাটতে ভালবাসি...'

খিলখিল করে হেসে উঠল ফোম। হাসি থামতে বলল, 'আমরা তাহলে বন্ধু, কেমন? আমিও ভালবাসি তোমার মত—যাকগে, এই, বাদাম খাবে?'

ঘাসের উপর থেকে একটি বড় পাতার মোড়ক তুলল ফোম। বলল, 'জংলী বাদাম। এর নাম চিমি। খুব স্বাদ। এখানে ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এ বাদাম পাবে না। নাও।'

এগিয়ে গিয়ে ফোমের হাত থেকে কয়েকটি বাদাম তুলে নিল রাসেল।

বাদামগুলো খুব ছোট-ছোট। বাদামের গা বাদামী রঙের কিন্তু এটার গা খয়েরী। খেতে সত্যি অপূর্ব।

'তুমি কে গো?' কুয়াশা সবিস্ময়ে বলে উঠল ডান পাশ থেকে। চুপিসারে কখন

যে এসে দাঁড়িয়েছে তা ওরা বুঝতে পারেনি।

চমকে উঠে তাকাল ফোম কুয়াশার দিকে।

রাসেল বলল, 'ফোম, ইনিই মি. কুয়াশা। তোমার বাবার বন্ধু।'

'তুমি মঁসিয়ে মূরকোটের মেয়ে নাকি?' অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

ফোম বলল, 'হ্যাঁ। বাবা খুব বিপদে পড়েছেন। একদল পাজী লোক বন্দী করে রেখেছে বাবাকে। আমাকেও বন্দী করে রেখেছিল। কিন্তু আমি পালিয়ে এসেছি।'

কুয়াশা বলল, 'দাঁড়িয়ে কেন তোমরা, বসো। সব কথা আগে শোনা যাক। তারপর এগোনো যাবে।'

পাশাপাশি বসল রাসেল এবং ফোম মাটিতে পা ছড়িয়ে।

ওদের দু'জনার মুখোমুখি বসে কুয়াশা আপনমনে হাসতে হাসতে, ভাবল—ওদের দুজনকে মানিয়েছে বড় চমৎকার।

আধঘন্টা পর জঙ্গলের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা তিনজন। জঙ্গলের বাইরে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে সিনেমার পর্দায় যেমন বিচিত্র দৃশ্য ফুটে ওঠে, তেমনি অপূর্ব সব দৃশ্য ফুটে উঠল ওদের চোখের সামনে।

প্রায় শ' দুয়েক বন্য ঘোড়া তীরবেগে দলবদ্ধভাবে ছুটে যাচ্ছে প্রকাণ্ড লম্বা মাঠের উপর দিয়ে। সূর্যের কিরণ লেগে ঘোড়াগুলোর লাল গা চকচক করছে। আর এক দিকে গোটা পাঁচেক ঈমু দাঁড়িয়ে আছে।

চার ফুট থেকে ছয় ফুট উঁচু এক একটি ঈমু। বড় আশ্চর্য পাখি। মানুষের চেয়ে লম্বা কম নয় এরা। পা জোড়া সরু কিন্তু অসম্ভব শক্ত। ঈমুর পায়ের লাথি খেয়ে বহু মানুষ মারা গেছে। একটা তেজী ঘোড়াকেও লাথি মেরে ভূপাতিত করতে পারে একটা ঈমু। উড়তে না জানলে কি হবে, এদের মত দৌড়বিদ গোটা পৃথিবীতে আর কোন পাখি নেই। ঘন্টায় ষাট মাইল বেগে একটা ঈমুকে দৌড়াতে দেখলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

গাছে চড়তে পারে না ঈমু। এরা বাস করে মাটির নিচে, গর্ত করে। ঝোপের ভিতরও থাকে এরা।

সূর্যের দিকে পিছন ফিরে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে ঈমুগুলো। মাঝেমধ্যে এমনি করে দাঁড়িয়ে থেকে ধ্যান করা ওদের অভ্যাস।

মাঠের পর খাড়া একটি পাহাড়।

পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল কুয়াশা।

পিছনে রাসেল এবং ফোম। মানুষের মত বড় বড় পাখিগুলোর দিকে সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে ওরা দুজন। ফোম রাসেলকে ঈমুর পিঠে চড়িয়ে দিয়ে শখ মেটাতে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

মাঠ পেরিয়ে পাহাড়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। পিছন ফিরে একবার তাকাল সে। রাসেল এবং ফোম মাঠের মাঝখানে ছুটোছুটি করছে। ওদের দুজনের আগে আগে ছুটছে দলবদ্ধ ভাবে ঈমুগুলো। ধরতে পারছে না ওরা একটাকেও।

পাহাড়ে চড়তে শুরু করল কুয়াশা। দূর থেকে যতটা খাড়া মনে হয়েছিল ততটা খাড়া আসলে নয় পাহাড়টা। তবে তরতর করে উঠে যাবারও উপায় নেই। ভেবেচিন্তে, মাথা খাটিয়ে দেখেশুনে পা ফেলতে হচ্ছে কুয়াশাকে।

প্রায় বিশ মিনিট অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর কুয়াশা পাহাড়ের প্রায় মাথার কাছে পৌঁছুল। সামনেই একটি গুহা। গুহা থেকে পাহাড়ের চূড়া মাত্র পনেরো হাত দূরে। প্রায় সমতলই বলতে হবে অবশিষ্ট জায়গাটুকু।

গুহার ভেতর ঢুকে বসে পড়ল কুয়াশা বিশ্রাম নেবার জন্যে।

মাঠে দেখা যাচ্ছে না রাসেল এবং ফোমকে। সম্ভবত পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছে ওরা।

বিশ্রাম শেষ করে ওঠার সময় হঠাৎ কুয়াশার চোখে পড়ল একটি জিনিস।

গুহা থেকে বাইরে যাবার একটা পথ দেখা যাচ্ছে। অনেকদিন থেকে যাওয়া-আসা করার ফলে পাথরের উপর দাগ পড়েছে। তারমানে এই গুহায় জন্তু-জানোয়াররা যাওয়া আসা করে থাকে।

ঘাড় ফিরিয়ে গুহার ভিতর দিকে তাকাল কুয়াশা।

গুহাটা বেশ বড়ই বলতে হবে। গুহার শেষ প্রান্তে একটি বড়সড় গর্ত দেখা যাচ্ছে।

গর্তের দিকে তাকিয়ে রইল কুয়াশা। হঠাৎ চোখ পড়ল গর্তের পাশে একটি হ্যাটের দিকে।

বুকের ভিতর ধ্বক করে উঠল কুয়াশার। অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল হ্যাটটার দিকে।

হ্যাটটা অতি পরিচিত কুয়াশার। কিন্তু এ হ্যাট এখানে আসে কি করে? ডি. কস্টা ডুবে মরেছে সমুদ্রে। তার হ্যাট এই পাহাড়ের গুহায় কেন?

ছয়

হ্যাটের দিক থেকে দৃষ্টি সরে গেল আবার গর্তের দিকে।

গর্তের ভিতরটা দেখা যাচ্ছে না।

গর্তের মুখটা দেখা যাচ্ছে। গর্তের ভেতর থেকে কালো রঙের একটি মাথা উঁচু হয়ে উঠছে ক্রমশ। খাড়া খাড়া কালো চুল। কালো না বলে কটা রঙের বলাই ভাল।

ধীরে ধীরে গর্তের উপর উঠছে মাথাটা।

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কুয়াশা।

ধীরে ধীরে উঠতে উঠতে হঠাৎ এক লাফে গর্তের বাইরে বেরিয়ে এল মাথাটা।

কুয়াশাকে দেখে তীক্ষ্ণ দু'সারি দাঁত বের করে গর্জে উঠল নেকড়েটা।

পরমুহূর্তে লাফ দিল বিদ্যুৎবেগে।

তৈরি হয়েই ছিল কুয়াশা। নেকড়ে লাফ দিলেও নিজের জায়গা থেকে সরল না কুয়াশা।

শূন্য থেকে দুই হাত দিয়ে লুফে নিল কুয়াশা আড়াই হাত লম্বা নেকড়েটাকে। লুফে নিয়ে এক সেকেণ্ড কালক্ষেপ না করে ছুঁড়ে দিল গুহার বাইরে হিংস্র জানোয়ারটাকে সবেগে।

পাহাড় থেকে ঝড়ের বেগে নিচের দিকে গেল নেকড়েটা। নিচের মাটিতে পড়ার সাথে সাথে ইহলীলা সাঙ্গ হবে তার।

ধীরে ধীরে গর্তের সামনে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। গর্তের ভিতর হাড় এবং রক্ত। গর্তের পাশ থেকে ডি. কস্টার হ্যাটটা তুলে নিল কুয়াশা। রক্তের দাগ ছাড়া আর কিছু নেই হ্যাটে।

গর্তের পাশেই ফেলে দিল কুয়াশা হ্যাটটা। গুহা থেকে বেরুবার আগে ব্যাগ এবং লেসার গানটা তুলে নিল ও।

পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এল কুয়াশা। রাসেল আর ফোমের হাসির শব্দ ভেসে আসছে পিছন থেকে। বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে গল্প করতে করতে উঠে আসছে ওরা।

মিনিট পাঁচেক পর পাহাড় থেকে নামতে শুরু করল কুয়াশা। এদিকে পাহাড় থেকে নামাটা সহজ। ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাহাড়।

আরও খানিকদূর নামার পর সমতল একটি জায়গা পেল কুয়াশা। এখানে পাথর মাটি মেশানো। মাটির পরিমাণ আবার কোথাও কোথাও বেশি। গোটাতিনেক ইউক্যালিপটাস গাছ দাঁড়িয়ে আছে একধারে। গাছগুলোর পঁচিশ-ত্রিশ হাত দূরে একটি পাহাড়ী ঝর্না।

ঝর্নার পাশে দাঁড়িয়ে লেসার গান এবং চামড়ার ব্যাগটা নামিয়ে রাখল কুয়াশা।

ঝর্নার পানি হাতের আঁজলা ভরে পান করতে লাগল।

'ঘোঁত্।'

বিদ্যুৎবেগে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল কুয়াশা।

শারা শরীরের লোম খাড়া হয়ে উঠল কুয়াশার।

ধীরে ধীরে সোজা হলো কুয়াশা।

প্রকাণ্ড দৈত্যাকার মানুষটি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল, 'ঘোঁত্!'

পা তুলল দৈত্য। সামনে বাড়ল একপা। মাটিতে পা ফেলায় কেঁপে উঠল মাটি।

অতি ধীরে ঘুরে দাঁড়াল কুয়াশা। দাঁতে দাঁত চেপে, মাথা ঘুরিয়ে বিদঘুটে রবে প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করল দৈত্য।

কখন, কুয়াশার অজ্ঞান্তে ড. মূরকোটের দৈত্যকার সুপারম্যান মাত্র পাঁচ হাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

আড়চোখে তাকাল কুয়াশা দুই হাত দূরে মাটিতে রাখা লেসার গানের দিকে।

কিন্তু পরমুহূর্তে কুয়াশা ভাবল, লেসার গান ব্যবহার করার প্রশ্নই ওঠে না। অনেক সাধনা, অনেক পরিশ্রম, অনেক ঝুঁকি এবং অনেক ত্যাগের পর এই সুপারম্যান তৈরি করেছেন ড. মূরকোট। এখনও সম্পূর্ণ করতে পারেননি তিনি সুপারম্যানকে। সুপারম্যান তৈরি করেছেন ঠিক, কিন্তু তাকে কন্ট্রোল করতে পারছেন না। নিজের হাতে তৈরি সুপারম্যান এখন ড. মূরকোটকে হত্যা করতে চায়—ধ্বংস করে ফেলতে চায় বৃদ্ধের ল্যাবরেটরি। নিশ্চয়ই অপারেশন করে সুপারম্যানের ব্রেনে যন্ত্র ঢুকিয়ে দেবার সময় কোন ত্রুটি রয়ে গেছে। সেই ত্রুটি ধরতে পারলেই অনেকদিনের আশা সফল হবে বৃদ্ধের।

সুপারম্যানকে হত্যা করা চলবে না, ভাবল কুয়াশা। ড. মূরকোট তাহলে হয়তো পাগলই হয়ে যাবেন।

কিন্তু এই হিংস্র অতিমানবের হাত থেকে বাঁচার উপায় কি?

হিপনোটিজম!

সম্মোহিত করা যায় না সুপারম্যানকে? সুপারম্যানের দুই চোখের দিকে তাকাল কুয়াশা।

কিন্তু চোখ সরিয়ে নিল দৈত্য কুয়াশার চোখের ওপর থেকে।

দুই হাত দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে নিজের বুকে ঘা মারল দৈত্য। কুয়াশার প্রায় চারগুণ স্বাস্থ্য দৈত্যের। টেনিস বলের মত বড় বড় এক জোড়া চোখ। হাতির পায়ের মত পা। প্রায় একশো ইঞ্চি বুকের ছাতি।

হঠাৎ দৈত্য ঝাঁপিয়ে পড়ল কুয়াশাকে লক্ষ্য করে।

বিদ্যুৎবেগে একপাশে সরে গেল কুয়াশা। সরে গিয়ে লাফিয়ে উঠে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল দৈত্যের নাক বরাবর।

ঘুসি লাগল। কিন্তু চোয়ালে, নাকে নয়। ব্যথায় টন টন করে উঠল কুয়াশার হাত। কিছুই হয়নি তার।

এর সাথে লড়ে জয়ী হওয়া অসম্ভব। বুঝতে পারল কুয়াশা।

কিন্তু আত্মরক্ষার চেষ্টা করতেই হবে। একটা শক্তিশালী কিন্তু প্রায় বুদ্ধিহীন অতিমানবের হাতে প্রাণ হারানোর কথা ভাবাই যায় না।

আবার হুঙ্কার ছাড়ল দৈত্য। তারপর এগিয়ে আসতে শুরু করল দুই হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে। এবার আর লাফিয়ে পড়ার ইচ্ছা নেই তার। কুয়াশার গলা ধরবে সে। গলা ধরে দম বন্ধ করে হত্যা করবে।

পিছিয়ে যেতে শুরু করল কুয়াশা। দ্রুত ভাবছে সে। নিশ্চয়ই দুর্বল কোন জায়গা আছে দৈত্যের শরীরে। নার্ভগুলোর উপর আক্রমণ চালাতে হবে।

হঠাৎ দৈত্য উৎকট স্বরে উল্লাস ধ্বনি করে উঠল।

চমকে উঠল কুয়াশা।

দৈত্য কুয়াশার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে তাকিয়ে আছে অন্য দিকে। দৈত্যের দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকাল কুয়াশা।

জোশান ফোম এবং রাসেল দাঁড়িয়ে আছে অদূরে।

ফোম ধাক্কা মারছে রাসেলকে। ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বলেছে, 'পালাও, রাসেল, পালিয়ে যাও! প্লীজ, আমার কথা ফেলো না। জোনজাকে তুমি চেনো না। ধরতে পারলে ফেড়ে ফেলবে চোখের পলকে—পালাও…?'

'কিন্তু তুমি—?'

রাসেলের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হলো না ফোমের।

হঠাৎ পাহাড় কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল দৈত্য জোনজা। ঝড়ের বেগে ছুটতে শুরু করল সে।

ফোমের সামনে গিয়ে থামল ঝড়। বিদ্যুৎবেগে দুই হাত দিয়ে ফোমের সরু কোমর জড়িয়ে ধরল সে। এক ঝটকায় দৈত্য তুলে নিল নিজের কাঁধে ফোমকে। তারপর আবার দৌড়ুতে শুরু করল।

কুয়াশা ছুটতে শুরু করেছিল দৈত্যের পিছু পিছু। কিন্তু ফোম চিৎকার করে বলল, 'মিথ্যে চেষ্টা করে লাভ নেই। আমাকে জোনজা ছাড়বে না। আপনারা বাবাকে উদ্ধার করার জন্যে এগিয়ে যান। আমি যে পথে বলেছি সে পথেই যাবেন।'

'কিন্তু তুমি?' চিৎকার করে জানতে চাইল রাসেল। সে-ও ছুটছে প্রাণপণে দৈত্যের পিছু পিছু।

ঝড়ের বেগে নেমে যাচ্ছে দৈত্য পাহাড় থেকে।

দৈত্যের কাঁধ থেকে চিৎকার করে বলল ফোম, 'আমার জন্যে চিন্তা কোরো না রাসেল। আমার কোন ক্ষতি করবে না জোনজা। ছেলেবেলার বন্ধু ও আমার। বিদায়, আবার হয়তো দেখা হবে…।'

ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে এল ফোমের কণ্ঠস্বর।

দৌড়ানো বৃথা। দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। রাসেল বলল, 'ফোমকে খুন করবে দৈত্যটা, আমরা কি তা জেনেও ওকে উদ্ধার করার চেষ্টা করব না?'

কুয়াশা বলল, 'খুন করবে বলে মনে হয় না। ফোম কি বলল শুনলে না?'

'কিন্তু ফোমের ধারণা তো ভুলও হতে পারে?' ব্যাকুল গলায় বলল রাসেল।

কুয়াশা হাসল মৃদু। বলল, 'চিন্তা কোরো না, রাসেল। ফোমের ধারণা ভুল হবার সম্ভাবনা কম।'

কুয়াশা ঝর্ণার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল।

'ওদিকে যাচ্ছেন যে?'

'এসো একটা জিনিস দেখাই তোমাকে।'

ঝর্ণার কাছে এসে কুয়াশা মাটি থেকে একটা শার্ট তুলল। রাসেলের দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ডি. কস্টার শার্ট।'

'ডি. কস্টার শার্ট! কি বলছেন আপনি!'

গুহায় ডি.কস্টার হ্যাট দেখার কথাও বলল কুয়াশা রাসেলকে।

'এই রহস্যের মানে? ডি.কস্টার হ্যাট, শার্ট—কোথা থেকে এল।'

'জানি না!' বলল কুয়াশা, 'জানার চেষ্টা করা দরকার। কিন্তু হাতে সময় বড় কম। আগে আমাদেরকে পৌঁছতে হবে ড. মূরকোটের শত্রুদের আস্তানায়। ড. মূরকোটকে উদ্ধার না করে আমি আর কোন কাজে হাত দিতে চাই না।'

রাসেল বলল, 'সন্ধ্যার আগে কি আমরা ড. মূরকোটের শত্রুদের আস্তানায় পৌঁছুতে পারব।'

কুয়াশা বলল, 'কিন্তু ফোমের কথা অনুযায়ী ড. মুরকোট সেখানে নেই। তিনি তার ল্যাবরেটরিতেই বন্দী আছেন। জংলীদের একটি গ্রামে। আমরা প্রথমে ধ্বংস করব শত্রুদের আস্তানা।'

'তাই চলুন।'

পাহাড় থেকে নামতে শুরু করল ওরা।

পাহাড়ের নিচে জঙ্গল। জঙ্গল ধরে ফোমের নির্দেশিত পথে গেলে আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে ওরা শত্রুদের সুরক্ষিত দুর্গে।

লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল পেটের ঝোলা থেকে একটি ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা। মায়ের ঝোলা থেকে বেরিয়েই চার পায়ে ছুটতে ছুটতে একেবারে সামনা-সামনি এসে পড়ল রাসেলের।

'এসো, কোলে উঠবে?'

রাসেলের কথা শুনল বাচ্চাটা কান খাড়া করে। সবজান্তার মত মাথা নাড়ল, তারপর পিছন ফিরে তাকাল। মাকে দেখতে পেয়েই ঘুরে ছুটল আবার। পাঁচ হাত দূর থেকেই লাফ দিল সে। লাফ দিয়ে মায়ের ঝোলার ভিতর সেঁধেয়ে গেল। মা ছুটল দ্রুত। দেখতে দেখতে মা সন্তানকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের আড়ালে।

'দাঁড়াও!' ফিসফিস করে নির্দেশ দিল কুয়াশা।

দাঁড়িয়ে পড়ল রাসেল। অদূরে ডেকে উঠল একটা লিয়ার পাখি। লিয়ারের ডাক থামতেই একসাথে সাড়া দিল দুটো পুরুষ গাধা।

পাতার ফাঁক দিয়ে সামনের দিকে তাকাল কুয়াশার দেখাদেখি রাসেল।

পাতার ফাঁক দিয়ে ওরা দেখল মাত্র দশ-পনেরো হাত দূরে একটা পাঁচিল। প্রায় দু'মানুষ উঁচু হবে পাঁচিলটা। পাঁচিলের মাথায় কাঁটা তারের বেড়া।

'ইলেট্রিফায়েড তার, তাই না?' মৃদু হেসে তাকাল রাসেল কুয়াশার দিকে।

'সম্ভবত!' বলল কুয়াশা।

পাঁচিলের ভিতরের রহস্য বাইরে থেকে বোঝার কোন উপায় নেই। নৃলারবর প্লেনের গহীন জঙ্গলে মোটা কংক্রিটের পাঁচিল—কল্পনাই করা যায় না! সভ্য মানুষ এই জঙ্গলে একাধিকবার প্রবেশ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। হিংস্র জন্তু-জানোয়ারগুলোকে হত্যা করে কেউ কেউ এক আধ মাইল গভীরে ঢুকতে সমর্থ হলেও জংলীদের বুমেরাং এবং বিষ মেশানো তীরের আক্রমণে শেষ অবধি প্রাণ হারিয়েছে সবাই। বর্তমান শতাব্দীতে কোন মানুষ এই ভয়ঙ্কর জঙ্গলে ঢোকার চেষ্টা করেছে বলে শোনেনি কুয়াশা। একমাত্র ড. মূরকোটই এই বিপদসঙ্কুল বনভূমিতে প্রবেশ করার মত দুঃসাহস দেখিয়েছেন। কিন্তু বীরত্ব দেখাবার জন্যে এই ঝুঁকি নেননি তিনি। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মঁসিয়ে মূরকোট পুলিসের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন এখানে। ক্যানবেরা থেকে পালাবার সময় পুলিসের গুলিতে নিহত হন ড. মূরকোটের স্ত্রী। ছেলে এবং মেয়েকে নিয়ে কোন মতে পালিয়ে এসেছেন তিনি। কোন্ পথে কিভাবে এই রহস্যময় বনভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন তিনি কেউ তা জানে না। কুয়াশা শুধু জানে ড. মূরকোটকে জংলীরা হত্যা করেনি। হত্যা করা তো দূরের কথা, অসভ্য লোকগুলো তাঁকে দেবতার মতই শ্রদ্ধা করে। জংলীদের হৃদয়ে স্থান পেয়ে আর কোন চিন্তা নেই ড. মূরকোটের। অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল সরকার আজও তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। দু'জন মানুষকে হত্যা করার দায়ে ড. মূরকোটের অনুপস্থিতিতেই বিচার হয়ে গেছে। রায় দিয়েছে জুরীরা, 'মৃত্যুদণ্ড'।

মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে শুনে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন ড. মূরকোট। তখন তিনি ক্যানবেরা থেকে দু'হাজার মাইলেরও বেশি দূরে পোর্ট হেড ল্যাণ্ডের ছোট একটা হোটেলে আত্মগোপন করে আছেন। প্রাণের ভয়ে বিচলিত হননি ড. মূরকোট। ধরা পড়লে তাঁর সাধের বিজ্ঞান সাধনা সফলতার চরম মুহূর্তে ব্যর্থ হয়ে যাবে মনে করে চঞ্চল হয়ে পড়লেন তিনি। সিদ্ধান্ত নিলেন, পালাতে হবে।

খুন ঠিক করেননি ড. মূরকোট। দু'জন তরুণ সহকারীর দেহের উপর পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। পরীক্ষা ব্যর্থ হয়। ফলে মারা যায় তার প্রিয় দুই সহকারী।

ড. মূরকোট ছাড়া এ গভীর জঙ্গলে আর কোন সভ্য মানুষ আজ অবধি প্রবেশ করতে পারেনি বলেই জানত কুয়াশা। কিন্তু জোশান ফোমের কথা শুনে এখন বোঝা যাচ্ছে একদল সশস্ত্র শয়তান কুমতলব নিয়ে এই গহীন বনভূমিতে প্রবেশ করেছে।

'আমরা ভুল পথে এসেছি,' বলল রাসেল।

'হ্যাঁ,' বলল কুয়াশা. 'ফোমের বলে দেয়া পথ ধরে আমরা যদি আসতাম তাহলে শত্রুদের এই আস্তানার সামনের দিকে পৌছুতাম আমরা। কিন্তু এ বরং

ভালই হয়েছে। পিছন দিক দিয়েই ভিতরে ঢুকব আমরা।'

কুয়াশা হঠাৎ ভুরু কুঁচকে তাকাল। কি যেন শোনার চেষ্টা করছে সে।

'হ্যাঁ। দূরে কোথাও শোরগোল হচ্ছে,' রাসেল বলল।

কুয়াশা বলল, 'ফোম বলেছিল শত্রুদের আস্তানা থেকে জংলীদের গ্রাম বেশ খানিকটা দূরে। উত্তরে।'

'উত্তর দিক থেকেই আসছে গোলমালের শব্দটা। জোনজা ফোমকে নিয়ে গ্রামেই হয়তো ঢুকেছে।'

'হতে পারে।'

কুয়াশা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় পা দিল। 'এসো। ওপরে ওঠার চেষ্টা করি।'

ব্যাগ থেকে দড়ির সিঁড়ি বের করে পাঁচিলের উপর দিকে ছুঁড়ে দিল রাসেল। প্লাস্টিকের হাতলওয়ালা একটা টেস্টার দিল কুয়াশা, 'এই নাও।'

উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে রাসেল খানেকটা উপরে।

কাঁটাতারের বেড়া পরীক্ষা করে উপর থেকে নিচু গলায় রাসেল বলল, 'ইলেকট্রিফায়েড।'

'এই নাও।'

লম্বা হাতটা উপর দিকে তুলে ধরল কুয়াশা। কুয়াশার হাত থেকে তার কাটার প্লায়ার্সটা নিল রাসেল।

তার কেটে ফেলল রাসেল দ্রুত। পাঁচিলের উপর উঠে দাঁড়াল ও। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল কুয়াশা।

পাঁচিলের উপর থেকে শত্রুদের আস্তানার দিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না ওরা। নিচে ঝোপঝাড়। নিঃশব্দে নেমে পড়ল দু'জন। ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

প্রায় পাঁচ মিনিট পর সামনে দেখা গেল সাদা চুনকাম করা একটা একতলা বাড়ির পিছনের দিক। কেউ নেই কোথাও। ছোট্ট একটা বারান্দা দেখা যাচ্ছে। বারান্দার উপর একটা দরজা। বন্ধ।

বারান্দার দিকে সন্তর্পণে এগিয়ে চলল ওরা।

'আমরা আসছি তা ওরা জানে,' রাসেল বলল। 'অথচ কেউ নেই কেন বাধা দেবার জন্যে?'

কুয়াশা নিচু গলায় বলল, 'ওরা চায় আমরা ভিতরে ঢুকে ফাঁদে পা দিই। ওরা ঠিকই নজর রাখছে আমাদের ওপর।'

রাসেল বলল, 'কিংবা ওরা হয়তো ভেবেছে আমরা প্রথমে জংলীদের গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করব। ফোমের সাথে আমাদের দেখা হয়েছে, কথাবার্তা হয়েছে তা তো আর ওরা জানে না।'

কুয়াশা হঠাৎ ফিসফিস করে বলে উঠল, 'সাবধান রাসেল। বাড়ির ছাদে ওত পেতে আছে একজন লোক। মুভমেন্ট লক্ষ্য করেছি আমি। তাকিয়ো না ওদিকে। রাইফেলের নল দেখেছি, কিন্তু গুলি করবে বলে মনে হয় না।'

সামান্য খানিকটা দূরেই বারান্দা। স্বাভাবিক ভাবে এগিয়ে চলল ওরা। কুয়াশার কাঁধে লেসার গান।

রাসেলের রাইফেলটা ওর হাতেই রয়েছে। আড়চোখে একবার ছাদের দিকে তাকাল ও। দেখা গেল পলকের জন্যে একটা রাইফেলের নল আর একজন লোকের মাথার খানিকটা অংশ।

নিরাপদেই বারান্দায় উঠল ওরা।

'শত্রুরা আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে,' বলল রাসেল।

হঠাৎ হাসি ফুটে উঠল কুয়াশার ঠোঁটে।

'হাসছেন যে?' রাসেল জানতে চাইল।

'এবার আমরা শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করব। কিভাবে বলো তো?'

হেসে ফেলল রাসেল।

বলল, 'বুঝেছি। ছাদের লোকটা আমাদেরকে বারান্দায় উঠতে দেখে দলের অন্যান্যদেরকে খবর দেয়ার জন্যে নামতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। এই মুহূর্তে আমরা যদি ছাদে উঠি তাহলে ওদেরকে বোকা বানানো সহজ হবে। চলুন তাহলে।'

বারান্দা থেকে নেমে ওরা ছাদের দিকে তাকিয়ে এবার কিছু দেখতে পেল না।

দড়ির সিঁড়ি ছুঁড়ে দিল আবার রাসেল। রেলিংয়ে আটকে গেল সেটা। তরতর করে উঠে গেল কুয়াশা ছাদে। পিছন পিছন উঠে এল রাসেল। ফাঁকা ছাদ। কেউ নেই।

সতর্ক পায়ে এগিয়ে চলল ওরা ছাদের উপর দিয়ে। কিনারার কাছাকাছি পৌঁছে মাথা নিচু করে ফেলল কুয়াশা। তারপর বসে পড়ল। বসে বসেই উঁকি দিয়ে তাকাল নিচের দিকে।

দু'জন গার্ড চাপা স্বরে কথাবার্তা বলছে বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে। দুজনের হাতেই রাইফেল।

'খবরদার! নড়াচড়া করলেই গুলি করব।'

লোক দুজন শ্বেতাঙ্গ। ইংরেজিতেই হুকুম করল রাসেল, 'রাইফেল ফেলে দিয়ে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও।'

অবাক বিস্ময়ে লোক দুজন চোখ তুলে তাকিয়ে আছে ছাদের উপর দিকে।

লেসার গান ধরা ডান হাতটা মাথার উপর তুলে দিয়ে ছাদ থেকে প্রকাণ্ড এক বাদুড়ের মত লাফ দিয়ে উঠানে নামল কুয়াশা।

পিছিয়ে গেল গার্ড দুজন এক পা করে ভয়ে। রাসেলও লাফ দিয়ে একতলার

ছাদ থেকে সবেগে নেমে এল নিচে।

রাইফেল দুটো ফেলে দিল গার্ড দুজন। মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াল তার

'ওই যে তোমার পঙ্খীরাজ ঘোড়া, রাসেল।'

উঠানের বাঁ প্রান্তে আঙুল তুলে দেখাল কুয়াশা। রাসেল সেদিকে তাকাল।

'ওর ভিতরে কেউ আছে?' কুয়াশা একজন গার্ডকে জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'আর সবাই কোথায়? তোমাদের বস্?'

গার্ড দুজন পরস্পরের দিকে তাকাল। উত্তর দিল না।

রাসেল বলল, 'আপনি ওদের কাছ থেকে কথা আদায় করার চেষ্টা করু আমি ঘোড়াটার কলকজা নষ্ট করে দিয়ে আসি।'

কুয়াশা বলল, 'নষ্ট করতে চাও কেন?'

'শত্রুরা পালাবার চেষ্টা করতে পারে।' রাসেল যুক্তি দেখাল, 'এই গভ জঙ্গলে ওই যান্ত্রিক ঘোড়া ছাড়া শত্রুদের পালাবার উপায় নেই। আমরা বা ভিতরটা তল্লাশি চালিয়ে গ্রামের দিকে যাব, তাই না? সেই ফাঁকে শত্রুপক্ষ এখ ফিরে আসতে পারে। বিপদ টের পেলেই পালাবার চেষ্টা করবে।'

কুয়াশা গার্ড দুজনকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা ছাড়া আর কে কে আ বাড়িতে?'

'কেউ নেই।'

'কোথায় গেছে সবাই?'

'জংলীদের গ্রামে?'

'কেন? গ্রামে কি হয়েছে?'

'জোনজাকে চেনেন? জোনজা খেপে গেছে। অনেক লোককে খুন ব ফেলেছে সে। কেউ তাকে সামলাতে পারছে না।'

দ্বিতীয় গার্ডটি বলল, 'মি. মূরকোটের মেয়ে মিস ফোম ছাড়া আর ে জোনজাকে সামলাতে পারে না। কিন্তু মিস ফোম পালিয়ে গেছে গতকাল আমা এখান থেকে।'

প্রথম গার্ডটি বলল, 'বেঁচে আছে বলে মনে হয় না। গোটা জঙ্গলের কোথ আমরা খুঁজতে বাকি রাখিনি। নেকড়ে কিংবা হায়েনারা ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে ি ফোমকে।'

'তোমার বসের নাম কি?'

'মি. ডেভিড।'

'জংলীদের আস্তানায় গেছে সে?'

'হ্যাঁ।'

কুয়াশা তাকাল রাসেলের দিকে, 'এদের দুজনকে বেঁধে ফেলো। একটা ঘরে দুজনকে বন্দী করে রেখে দ্রুত বাড়িটা পরীক্ষা করে চলো আমরা গ্রামের দিকে যাই। জোনজা কি করছে দেখা দরকার।'

ব্যাগ থেকে নাইলনের কর্ড বের করল রাসেল।

লোক দুজনকে বেঁধে রাসেল ওদের পকেট সার্চ করল। দুজনের পকেট থেকে ছোরা পাওয়া গেল। একজনের পকেটে পাওয়া গেল একগোছা চাবি।

কুয়াশা বলল, 'চলো! বাড়ির ভিতরে তোমাদেরকে বন্দী করে রাখা হবে।'

পা বাড়াল লোক দুজন।

মনে মনে বেশ একটু বিস্মিত হলো রাসেল। গার্ড দুজনের এমন শান্ত-শিষ্ট আচরণ করার কারণ কি?

'তোমরা আমাদেরকে দেখে গুলি করনি কেন? তোমাদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে আমাদের হাতে বন্দী হতেই যেন চেয়েছিলে? আসল ব্যাপারটা কি?' রাসেল প্রশ্ন করল।

'বস্ গুলি করতে নিষেধ করে গেছেন,' আগে আগে হাঁটতে হাঁটতে বলল একজন লোক।

'কেন? তোমাদের বসের উদ্দেশ্যটা কি?'

'আপনাদেরকে বন্দী করার নির্দেশ ছিল আমাদের ওপর। তবে বসের ধারণা ছিল আপনারা এখানে আসবেন না। গ্রামের দিকেই আপনারা যাবেন ভেবেছিলেন তিনি। তাই আমাদের চারজনকে এখানে রেখে তিনি চারজনকে নিয়ে গ্রামে চলে গিয়েছিলেন।'

'চারজন?' রাসেল তাকাল কুয়াশার দিকে।

দ্বিতীয় গার্ডটি বলল, 'হ্যাঁ। গ্রামের দিক থেকে হৈ-চৈ-এর শব্দ হতে দু'জনকে আমরা পাঠিয়েছিলাম। তারা ফিরে এসে জোনজার কীর্তিকলাপের কথা জানিয়ে আবার চলে গেছে গ্রামে।'

'কতদিন হলো তোমরা এখানে আস্তানা গেড়েছ?'

'মাস দুয়েক হয়েছে।'

'উদ্দেশ্য কি তোমাদের?'

প্রথম গার্ডটি বলল, 'আমাদের বসের মুখেই শুনবেন সব।'

'তোমাদের বসের পেশা কি?'

চুপ করে রইল গার্ড দুজন।

মৃদু হেসে রাসেল বলল, 'ভেবেছ আমরা কিছু জানি না? ভুল করছ তোমরা। তোমাদের আসল পরিচয় এবং উদ্দেশ্য আমরা জানি। তোমরা মাফিয়ার পলাতক আসামী। মাফিয়ার সদস্য হলেও তোমরা দলের নির্দেশ পালন করতে ব্যর্থ হয়েছ বলে ভয়ে পালিয়ে এসেছ। পুলিসও খুঁজছে তোমাদেরকে। এখানে এসে তোমরা ড.

মূরকোটের সুপারম্যান তৈরি করার ফর্মূলা ছিনিয়ে নেবে ড. মূরকোটের কাছ থেকে। তাই না?'

অবাক বিস্ময়ে গার্ড দুজন পরস্পরের দিকে তাকাল। প্রথম গার্ডটি জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু এতগুলো কথা আপনাদেরকে কে বলল?'

'আমরা পৃথিবীর সব অপরাধী সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখি। তোমাদের বসের নাম শুনেই বুঝতে পেরেছি সব। বাকিটা অনুমান।'

বারান্দায় উঠে চাবি দিয়ে একটি দরজার তালা খুলল রাসেল। গার্ড দুজনকে পিছনে রেখে ভিতরে ঢুকল ও।

প্রকাণ্ড একটা হলরুম। হলরুমের চারদিকে বড় বড় বাক্স। মাঝখানে বড় একটা টেবিল। টেবিলের দুইধারে অনেকগুলো চেয়ার।

'বাক্সগুলোয় কি?' জিজ্ঞেস করল রাসেল।

বন্দী দুজন হলরুমে ঢুকল। রাসেলের প্রশ্নের উত্তর দিল না তারা। বন্দীদ্বয়ের পিছু পিছু ঢুকল কুয়াশা।

রাসেল একটি বাক্স খোলার চেষ্টা করল।

বাক্স খুলতে দেখা গেল পঁচিশটা গ্রেনেড রয়েছে ভিতরে। কুয়াশার দিকে তাকিয়ে রাসেল বলল, 'অস্ত্র এবং গোলাবারুদের বাক্স এগুলো।'

'পাশের রুমটা খোলো,' কুয়াশা নির্দেশ দিল।

পাশের রুমটা খুলল রাসেল। এটা একটা বেডরুম। গার্ড দুজনকে বসানো হলো দুটো চেয়ারে। চেয়ারের সাথে বাঁধা হলো দুজনের দু' জোড়া পা।

বেডরুমের দরজায় তালা দিয়ে দিল রাসেল বাইরে থেকে। বাড়ির অন্যান্য রুমগুলো দ্রুত পরীক্ষা করে নিল ওরা। কেউ নেই আর।

দ্রুত বাড়ির গেট পেরিয়ে বাইরের জঙ্গলে চলে এল ওরা। বন্দীদের রাইফেল দুটো থেকে কার্তুজ বের করে একটা ঝোপের ভিতর লুকিয়ে রাখল রাসেল।

গ্রামের দিক থেকে আর্তনাদ ভেসে আসছে অবিচ্ছিন্ন ভাবে। হৈ-চৈ-এর শব্দ ক্রমশ বাড়ছেই।

শব্দ লক্ষ্য করে ছুটল ওরা দুজন।

সাত

এদিকের জঙ্গল খুব একটা গভীর হবে না বলে মনে করেছিল ওরা। কিন্তু ওদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো।

জঙ্গল এদিকে এতই ঘন এবং গভীর যে দশ-বারো হাত দূরের দৃশ্য দেখারও উপায় নেই। ছোটার চেষ্টা ত্যাগ করেছে ওরা।

মিনিট তিনেক দ্রুত হাঁটার পর হঠাৎ কুয়াশা থমকে দাঁড়াল।

'কি হলো?' পিছন থেকে প্রশ্ন করল রাসেল।

উত্তর দিল না কুয়াশা। রাসেল পাশে এসে দাঁড়াল। পাঁচ হাত দূরে একজন জংলী মুখ থুবড়ে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। কাঁধ অবধি লম্বা চুল জংলীটার। পেশী-বহুল অত্যন্ত শক্তিশালী দেহ। গায়ের রঙ উজ্জ্বল তামাটে। দু'কানের লতিতে ঝুলছে দুটো সোনার মাকড়ি। গলায় মুক্তোর মালা। হাতে সোনার বালা। পায়েও তাই।

এই প্রথম নূলারবর প্লেনের একজন জংলীকে দেখল ওরা।

জংলীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা।

'বেঁচে নেই,' রাসেল বলল।

জংলী এতটুকু নড়ছে না। মাথার পিছন দিকে ছোট একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে। গুলি করে মেরেছে কেউ।

জংলীকে পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা, 'প্রায় পনেরো মিনিট আগে মারা গেছে।'

'ডেভিডের লোকেরাই মেরেছে,' মন্তব্য করল রাসেল।

আবার এগিয়ে চলল ওরা। মাত্র পঁচিশ ত্রিশ গজ যাবার পর আবার থামতে বাধ্য হলো ওরা।

আর একজন জংলীর লাশ।

কুয়াশা এবং রাসেল পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকাল। লাশটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

প্রথম জংলী লোকটার মতই চেহারা লোকটার। একই রকম মজবুত স্বাস্থ্য। কোমরে গাছের পাতা দিয়ে তৈরি করা আচ্ছাদন।

লোকটার মাথার মগজ বেরিয়ে পড়েছে খানিকটা। মাথার পাশে, ঘাসের উপর, জমাট বেঁধে রয়েছে রক্ত।

'কেউ মাথায় ভারি কিছু দিয়ে ঘা মেরেছে,' বলল রাসেল, 'বুলেট না।'

'হয়তো জোনজার কাণ্ড।'

গ্রামের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। প্রচণ্ড শোরগোলের শব্দ হচ্ছে। ছুটতে শুরু করল ওরা।

পঞ্চাশ গজের মত এগোবার পর হঠাৎ সামনে দেখা গেল জংলীদের গ্রাম। গাছের আড়াল থেকে গ্রাম দেখতে পেয়েই থমকে দাঁড়াল ওরা।

গাছের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেক জংলী। নিঃশব্দে আতঙ্কিত চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছে জংলীরা গ্রামের দিকে। ডালপালা, গাছের বড় বড় পাতা দিয়ে তৈরি ছোট ছোট ঘর। ঘরগুলোর পিছন দিক দেখা যাচ্ছে।

জংলীদের হাতে তীর ধনুক। কারও কারও হাতে একটু বাঁকা লম্বা লাঠি। বুমেরাং। কিন্তু তীর বা বুমেরাং ব্যবহার করছে না কেউ।

জংলীদেরকে কুয়াশা এবং রাসেল লক্ষ্য করলেও জংলীরা ওদের দিকে মোটেই

তাকাচ্ছে না।

ছোট ছোট ঘরগুলোর মধ্যবর্তী সরু পথ দিয়ে তীর বেগে বেরিয়ে এল দুজন জংলী।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল রাসেল। দু'জন জংলীরই শরীরের বিভিন্ন জায়গা দিয়ে দর দর করে রক্ত ঝরছে। আর্তচিৎকার করতে করতে কুয়াশা এবং রাসেলকে পাশ কাটিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল জংলী দু'জন। একজন জংলীর মাথা ফেটে গেছে।

অপর জংলীটার ডান হাতটা নেই। কে যেন টেনে ছিঁড়ে নিয়েছে গোটা হাতটা।

হঠাৎ ছুটতে শুরু করল কুয়াশা। পিছু নিল রাসেল।

ঘরগুলোর মাঝখান দিয়ে কয়েক পা যেতেই ওরা গ্রামের ভিতর প্রবেশ করল।

সামনে ওরা মস্ত একটা খোলা উঠান দেখতে পেল। উঠানের চারধারে ছোট ছোট ঘর।

উঠানের উপর শত শত জংলী প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করছে। আতঙ্কিত কণ্ঠে সবাই চিৎকার করছে। দিশেহারা হয়ে পড়েছে সবাই। কুয়াশা এবং রাসেলের পায়ের কাছে দু'জন শ্বেতাঙ্গের লাশ পড়ে রয়েছে।

উঠানের সর্বত্র জংলীদের লাশ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক। কচি কচি উলঙ্গ বাচ্চাদের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে এদিক-সেদিক। নগ্ন মেয়েদের লাশই সবচেয়ে বেশি।

উঠানের পুবদিকে দেখা যাচ্ছে জোনজাকে। একদল জংলী খালি হাতে বাধা দেয়ার চেষ্টা করছে তাকে। জোনজার হাতও খালি।

মেঘ যেমন গর্জে ওঠে তেমনি বিকট স্বরে গর্জন করছে জোনজা। বিদ্যুৎবেগে জংলীদেরকে তাড়া করছে সে। জংলীরা ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। জোনজা একটি বড় ঘরের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। পর মুহূর্তে জংলীরা বাধা দেবার জন্যে এগিয়ে আসছে দলবদ্ধ ভাবে।

জংলীদের পিছনে দু'জন শ্বেতাঙ্গকে দেখা যাচ্ছে। তাদের হাতে রাইফেল। শ্বেতাঙ্গদের পিছনে একটি বড় ঘর। ঘরের ভিতর দেখা যাচ্ছে দু'জন লোককে। তারা দরজার দিকে পিছন ফিরে ঘরের ভিতর কি যেন করছে। দু'জনার মধ্যে একজনের হাতে একটা রিভলভার।

'ওই ঘরটাই ড. মূরকোটের ল্যাবরেটরি,' বলল রাসেল। 'ভিতরে যন্ত্রপাতি রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

কুয়াশা বলল, 'জংলীদের পিছনে শ্বেতাঙ্গ দু'জন রাইফেল নিয়ে কি করছে বুঝতে পারছ?'

'পারছি!' বলল রাসেল, 'জংলীদেরকে বাধ্য করছে জোনজাকে বাধা দেবার

জন্যে। কেউ পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি করবে।'

কথাগুলো বলেই রাইফেল তুলল রাসেল।

'রাসেল!' কুয়াশা বাধা দিতে চাইল।

কিন্তু কুয়াশার কথায় কান না দিয়ে পর পর দুটি গুলি করল রাসেল।

শ্বেতাঙ্গদের হাতে গিয়ে বিঁধল বুলেট। দু'জনের হাত থেকেই খসে পড়ল রাইফেল।

'ভালই করেছ।'

বড় ঘরটার দরজার সামনে একজন লোক এসে দাঁড়াল। গুলির শব্দ শুনেছে সে।

'ওই লোকটাই ডেভিড।'

ডেভিড প্রকাণ্ড পুরুষ। অসুরের শক্তি ওর দেহে, দেখেই বোঝা যায়।

কুয়াশা এবং রাসেলের দিকে তাকিয়ে আছে ডেভিড। তার হাতে রিভলভার।

ডেভিড তাকাল তার দুই আহত গার্ড দু'জনের দিকে। তারপর আবার চোখ তুলল। কি মনে করে ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের ভিতর দিকে তাকাল সে। কাকে যেন কি বলল।

রাসেল আবার রাইফেল তুলল। শব্দ হলো গুলির।

ডেভিডের মাথার দু'ইঞ্চি উপর দিয়ে রাসেলের রাইফেলের বুলেট চলে গেল।

ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকল ডেভিড।

'ব্যাটা হয়তো পালাবে!' বলে উঠল রাসেল। কুয়াশা ছুটল বড় ঘরটার দিকে।

জংলীদের মাঝখান দিয়ে ছুটতে ছুটতে বড় ঘরটার দরজার সামনে দাঁড়াল কুয়াশা। ওর হাতে লেসার গান।

ঘরের ভিতর ডেভিড নেই। ঘরের দ্বিতীয় দরজাটা খোলা। বাইরে থেকে ঘরটাকে বড় দেখালেও ভিতরে ঢুকে কুয়াশা দেখল ঘরটা তার চেয়েও অনেক বড়।

ঘরের এক কোণায় প্রকাণ্ড একটা ইন্সস্ট্রুমেন্ট প্যানেল।

ড. মূরকোটের ল্যাবরেটরি এবং কন্ট্রোলরুম এটা। ঘরের অপর কোণায় প্রকাণ্ড একটা ট্র্যান্সমিটার।

ড. মূরকোট বয়ঃভারে কুঁজো হয়ে গেছেন। দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। মাথার পিছনের ধবধবে সাদা চুল দেখা যাচ্ছে। ইন্সস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে সুইচ টিপছেন তিনি দ্রুত এলোপাতাড়ি ভাবে।

প্রচণ্ড শব্দ হলো পিছনে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল কুয়াশা। জোনজা ঘরের সামনে এসে পড়েছে। রাসেল খালি হাতে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

থমকে দাঁড়িয়েছে জোনজা দাঁতে দাঁত চাপছে সে। টেনিস বলের মত বড় বড় দুটো চোখ টকটকে লাল। দু'হাত দিয়ে নিজের বুকে চাপড় মারছে সে।

রাসেল দ্রুত ভাবছে। খালি হাতে বাধা দিতে হবে জোনজাকে। গুলি করা চলবে না। জোনজাকে বাধাও দিতে হবে আবার বাঁচিয়েও রাখতে হবে।

'মি. কুয়াশা!'

ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের দিকে তাকাল কুয়াশা।

সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন ড. মূরকোট। দুই চোখের নিচে কালি। ঠোঁট জোড়া মৃদু মৃদু কাঁপছে তাঁর। কুয়াশার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে আতঙ্ক।

'কেমন আছেন, ডক্টর?' প্রশ্ন করল কুয়াশা।

ড. মূরকোট বললেন, 'ভাল না, মি. কুয়াশা। সর্বনাশ ঘটে যাবে এখুনি, দয়া করে বাঁচাবার চেষ্টা করুন। জোনজা এই ঘরে ঢুকে যন্ত্রপাতি ভেঙে ফেলতে চাইছে। ও আমাকে মেরে ফেলুক, কিন্তু যন্ত্রপাতিগুলো যেন ছুঁতে না পারে...।'

কুয়াশা দ্রুত প্রশ্ন করল, 'জোনজার মাথার ভিতর রিসিভিং যন্ত্র প্রবেশ করিয়েছেন নিশ্চয়? সেটা কাজ করছে না বুঝি?'

'অপারেশনের সময় কোথাও কোন ত্রুটি রয়ে গেছে। সেই জন্যেই শর্ট-ওয়েভ সিগন্যাল রিসিভ করছে না ঠিকমত রিসিভিং যন্ত্রটা...।'

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল কুয়াশা। আশঙ্কায় হিম হয়ে গেল কুয়াশার সর্ব শরীর। ছুটে যেতে চাইল ও জোনজার দিকে। কিন্তু পারল না। হাত পা নড়ল না তার।

জোনজা দু'হাত দিয়ে অবলীলাক্রমে তুলে ধরেছে রাসেলকে মাথার উপর। রাসেল মেরুদণ্ড বাঁকা করে ছটফট করছে। জোনজা সবেগে দূরে ফেলে দিল রাসেলকে। একটি ঘরের ছাদে গিয়ে পড়ল রাসেল।

জোনজা কুয়াশার দিকে তাকাল। পর মুহূর্তে গর্জে উঠল সে।

'মি. কুয়াশা!'

ড. মূরকোট আতঙ্কিত কণ্ঠে ডেকে উঠলেন। ছুটে ঘরের এক কোণায় গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। চোখ ঢাকলেন দু'হাত দিয়ে।

জোনজাকে বাধা দেয়ার কেউ নেই।

জোনজা এগিয়ে আসছে ঘরের দিকে।

একলাফে ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। অসংখ্য সুইচ আর হাতলের সমষ্টি একটি প্যানেল। দ্রুত কয়েকটা সুইচ টিপল কুয়াশা।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। জোনজা বুক চাপড়াতে চাপড়াতে এগিয়ে আসছে দরজার দিকে।

দরজা বন্ধ করার কোন মানে হয় না। এক সেকেণ্ডও লাগবে না জোনজার দরজা ভাঙতে।

দরজার তুলনায় অনেক বড় দেহ জোনজার। দরজা দিয়ে ঢুকতে পারবে না

সে।

কিন্তু বাধাকে বাধা বলে মনে করার পাত্র নয় মূরকোটের আবিষ্কৃত সুপারম্যান জোনজা। দরজা ভেঙে ঘরের ভিতর ঢুকল সে।

পাগলের মত ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের সুইচ টিপছে কুয়াশা।

রিসিভিং সেট ফিট করার সময় ত্রুটি থাকলেও সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে বলে মনে হয় না যন্ত্রটা। সেই আশাতেই সুইচ টিপছে কুয়াশা।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

দ্রুত হাতে কাজ করে চলেছে কুয়াশা ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে। পিছন ফিরে তাকাচ্ছে সে বারবার। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া নেই জোনজার মধ্যে। বিকট স্বরে হুঙ্কার ছাড়ছে সে। রক্তে তার সর্বশরীর সিক্ত। এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে সে। এগিয়ে আসছে কুয়াশার দিকে।

কুয়াশা ৩৯

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই, ১৯৭৩

এক

বৃদ্ধ মঁসিয়ে মূরকোট থরথর করে কাঁপছেন। ঠোঁট জোড়া নড়ছে তাঁর। কি যেন ফিসফিস করে বলার চেষ্টা করছেন তিনি। কুয়াশার মাত্র দু'হাত সামনে প্রকাণ্ড দৈত্য জোনজা। কুয়াশার চেয়ে কমপক্ষে তিনগুণ বড় দেহ।

জোনজার বিকট অট্টহাসিতে চারদিক প্রকম্পিত। সেই সাথে নিজের বুকে আধমণ ওজনের ঘুসি মারছে সে। ঢাক-ঢোল বাজছে যেন।

ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের উপর একটা হাত কুয়াশার। কিন্তু তাকিয়ে আছে সে জোনজার দিকে।

এদিকে মঁসিয়ে মূরকোট পিছন থেকে কাঁপা পায়ে এগিয়ে আসছেন জোনজার দিকে।

দুর্বোধ্য ভাষায় গর্জন করছে জোনজা। কখনও সে হেসে উঠছে, কখনও দমাদম ঘুসি মারছে বুকে। দাঁতে দাঁত চাপছে অকারণ আক্রোশে। কট্ কট্ করে শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ বিপুল বেগে মাথা নাড়ছে। মুখ নেড়ে, বড় বড় হলুদ দাঁত বের করে কুয়াশাকে সামনে বাড়তে বলছে। নাকেমুখে রক্ত জোনজার। পরনে কোন পোশাক নেই। উদোম গা। সারা গায়ে শুকনো রক্ত। বড় বড় নখের ভিতর কাঁচা মাংস, চর্বি। সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। টেনিস বলের মত বড় বড় দুটো লাল চোখ থেকে যেন আগুন বেরুচ্ছে ঠিকরে।

ঘরের দরজার বাইরে প্রকাণ্ড উঠান। আহত এবং নিহত রক্তাপ্লুত জংলীদের বীভৎস লাশ উঠানের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। সুস্থ একজন জংলীকেও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ঘরের ভিতর লুকিয়েছে তারা। অনেকে প্রাণের ভয়ে গ্রামের বাইরে উঁচু গাছের মগডালে চড়ে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে আছে এদিকে।

রাসেলকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। জোনজা তাকে মাথার উপর তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে খানিক আগে। ডালপালা আর গাছের শুকনো পাতা দিয়ে তৈরি ঘরের চালে গিয়ে পড়েছিল ও। সেখানে এখন নেই রাসেল।

ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের বোতাম টিপছে কুয়াশা একটার পর একটা। জোনজার মাথার ভিতর ফিট করা রিসিভিং সেটে রেডিও ওয়েভ পাঠাবার অক্লান্ত চেষ্টা করছে সে। এক একটা বোতাম টিপছে আর জোনজার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। শান্ত হবার কোন লক্ষণ নেই জোনজার মধ্যে।

আরও এক পা এগোল জোনজা।

নিরস্ত্র কুয়াশার চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠছে আস্তে আস্তে। জীবনে এই প্রথম ভয় পেল কুয়াশা। জোনজাকে ইচ্ছা করলে হত্যা করা যায়। কিন্তু জোনজাকে হত্যা করা মানে ড. মূরকোটকে হত্যা করা। জোনজা মারা গেলে শোক কাটিয়ে উঠতে পারবেন না ড. মূরকোট। সারা জীবনের কঠোর ত্যাগ, নিরলস সাধনা এবং অমানুষিক পরিশ্রম করে তিনি তৈরি করেছেন জোনজাকে। চীন দেশে যাযাবর খিরগিজ আমা সম্প্রদায়ের সাথে পাঁচ বছর কাটিয়েছেন তিনি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে।

খিরগিজেই বসবাস করত খিরগিজ আমার সম্প্রদায়। কিন্তু পরে তারা চীন দেশে বসতি স্থাপন করে যাযাবরের জীবন ত্যাগ করে। এই খিরগিজ আমারাই প্রথম আবিষ্কার করে এই মানুষাকৃতি দৈত্য। খিরগিজ আমারা শল্য চিকিৎসার যাদুকর হিসেবে পরিচিত। তারা পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডটাকে বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় উত্তেজিত করে বড় করে তোলে। এর ফলে এক রোগের উৎপত্তি হয় মানবদেহে। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে তার নাম দেয়া হয়েছে জাইগ্যান্টিজম। এই রোগে আক্রান্ত লোক তার স্বাভাবিক চেহারার চেয়ে দু'গুণ বা চারগুণ বড় হয়ে যায়। দৈত্যের মতন বড় দেখায় তাকে। কিন্তু প্রকাণ্ড দেহের অধিকারী হলেও লোকটা তত ভয়ঙ্কর, হিংস্র, শক্তিশালী হয় না। তাই আধুনিক বিজ্ঞান সাধক ড. মূরকোট জাইগ্যান্টিজম প্রক্রিয়াটাকে আরও উন্নত করে জোনজার দেহের লম্বা হাড়গুলো শক্ত না হওয়া অবধি গ্ল্যাণ্ডটাকে বেশি ঘাটাননি। গ্ল্যাণ্ডটাকে না ঘাঁটিয়ে তিনি acroegoly-stage-এ নিয়ে আসেন। এরই ফলে তৈরি হয়েছে তাঁর নতুন আবিষ্কার সুপারম্যান—জোনজা।

জোনজার দৈহিক ক্ষমতা সম্পর্কে কুয়াশার কোন সন্দেহ নেই। কারও বুকে একটা পা রেখে শুধুমাত্র দেহের ভর দিয়ে দাঁড়ালেই হাড়গোড় গুঁড়ো করে তক্তার মত চ্যাপ্টা করে দিতে পারে জোনজা। কারও মাথায় একটা ঘুসি মারলে মাথার খুলি চার দু'গুণে আট টকুরো করে দিতে পারে অনায়াসে। পিঠে লাথি মারার সাথে সাথে ভেঙে দিতে পারে শিরদাঁড়া। পাঁচজন লোককে একসাথে ধরে শূন্যে তুলে ঘোরাতে পারে বনবন করে।

দুশ্চিন্তার রেখা কুয়াশার কপালে। কালো আলখাল্লার নিচে ত্বকের উপর দিয়ে ঘামের স্রোত নামছে নিচের দিকে। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে কপালে।

আর কোন পথ নেই। পালাবার কথা আর চিন্তা করাও যায় না। কুয়াশা পারবে না জোনজার সাথে দৌড়ে।

শক্তি পরীক্ষায় নামাটা আরও ভয়ঙ্কর হবে। লড়ে জেতবার আশা নেই বললেই চলে। তবে যুঝতে পারবে কুয়াশা খানিকক্ষণ। কিন্তু কুয়াশার উভয় সংকট। চরম

আঘাত যে আগে হানবে সেই জিতবে। জোনজাকে হত্যা করা চলবে না। অথচ নিজের প্রাণও রক্ষা করতে হবে।

কিন্তু দুটো সফলতা এক্ষেত্রে অর্জন করা অসাধ্য ব্যাপার। যে কোন একটা পথ বেছে নিতে হবে কুয়াশাকে। এখুনি।

ড. মূরকোট জোনজার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। নিচু, কাঁপা, করুণ গলায় তিনি জোনজাকে শান্ত হবার অনুরোধ জানাচ্ছেন। জোনজা ফিরেও তাকাচ্ছে না।

কাঁপা হাত দুটো উপর দিকে তুললেন ড. মূরকোট। দু'চোখ ভরা জল তাঁর। জোনজার কাঁধ অবধি নাগাল পেলেন না তিনি! আলতো ভাবে হাত রাখলেন তিনি জোনজার পিঠে।

সবেগে বাঁ হাত দিয়ে পিছন দিকে ঝাপ্টা মারল জোনজা। ভয়ঙ্কর অট্টহাসিতে কেঁপে উঠল চারদিক। ছিটকে দরজা দিয়ে উঠানে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়লেন ড. মূরকোট। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি।

দমাদম ঘুসি মারল জোনজা নিজের বুকে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ড. মূরকোটের দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে আবার গর্জন করে উঠল সে।

মুহূর্তের জন্যে প্যানেলের দিকে তাকাল কুয়াশা। কালো একটা বড় বোতামে চাপ দিল সে। তাকাল জোনজার দিকে।

'অ্যা—অ্যা—অ্যা—অ্যা—অ্যা…!'

বিকট স্বরে কেঁদে উঠল জোনজা। তড়াক করে লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল এক পা। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে, থরথর করে কাঁপছে জোনজা নামের পাহাড়টা। দুটো হাত মুখের সামনে তুলে আতঙ্কিত ভঙ্গিতে আঙুলগুলো ভাঁজ করছে আর ভাঁজ খুলছে জোনজা। অসহায়, ভীত ভাব ফুটে উঠেছে তার মুখের রেখায়, চোখের দৃষ্টিতে। হাত নাড়ার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ক্ষমা চাইছে সে। মুখ নাড়ার ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে পরিষ্কার প্রাণ ভিক্ষার আবেদন।

বিদঘুটে স্বরে আবার কেঁদে উঠল জোনজা। তড়াক করে লাফ দিয়ে আরও একপা পিছিয়ে গেল।

কুয়াশা বড় কালো বোতামটা চেপে ধরে রেখেছে। প্রতিক্রিয়া ঘটছে, বুঝতে পারছে কুয়াশা। সাফল্যের উজ্জ্বলতা ফুটে উঠেছে তার চোখেমুখে। একটা বোতাম অন্তত পাওয়া গেছে, যেটা জোনজার মাথার ভিতর ফিট করা রিসিভিং সেটে রেডিও ওয়েভ পাঠাতে সক্ষম।

রাসেলকে দেখা গেল দরজার বাইরে ড. মূরকোটকে তুলে নিয়ে সরে যাচ্ছে সে। হঠাৎ আবার দুর্বোধ্য স্বরে ককিয়ে উঠল জোনজা। বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়া সে। ছুটল।

ঘরের দরজার দিকে গেল না জোনজা। দেয়ালে গিয়ে বন্য হাতির মত ধা

দিল সে। ভেঙে পড়ল দেয়াল। দেয়াল ভেদ করে তীরের মত বেরিয়ে গেল জোনজা বাইরে।

বিকট স্বরে কাঁদতে কাঁদতে, আর্তচিৎকার করে ছুটছে, জোনজা।

ড. মূরকোটকে ছেড়ে জোনজার পিছু পিছু তেজি ঘোড়ার মত ছুটতে শুরু করল রাসেল।

দ্রুত ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল কুয়াশা। বজ্রকণ্ঠে সে চিৎকার করে বলল, 'ফিরে এসো, রাসেল! ওকে তুমি ধরতে পারবে না।'

কিন্তু দেখতে দেখতে তীরবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল রাসেল ঘন জঙ্গলে।

চিন্তিত ভাবে ঘুরে দাঁড়াল কুয়াশা। ড. মূরকোট সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

'কোথায় লেগেছে আপনার, ড. মূরকোট?' কুয়াশা প্রশ্ন করল।

চোখ ভরা পানি নিয়ে দু'হাত দিয়ে কুয়াশাকে আলিঙ্গন করলেন ড. মূরকোট। কাঁপছেন বৃদ্ধ। কিন্তু ভয়ে নয়, আনন্দে।

বললেন, 'আপনার ঋণ সারা জীবনেও শোধ করতে পারব না আমি, ড. কুয়াশা। আপনিই আমার একমাত্র শুভানুধ্যায়ী।'

'ছেলেটা কে?'

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে একদিকে আঙুল তুলে দেখাল কুয়াশা, 'খুব সুন্দর তো!'

উঠানের এক কোনা থেকে বারো তেরো বছরের একটি স্বাস্থ্যবান কিশোর এক গাল হাসি নিয়ে ছুটে আসছে।

'যোশান রোম।' বললেন ড. মূরকোট, 'আমার ছেলে। ওর মা ওকে একমাসের রেখে মারা গেছে।'

ছেলেটার বড় ভাল স্বাস্থ্য। বারো-তেরো বছর বয়স, সুন্দর, কিন্তু দেখতে আঠারো-উনিশের মত। বাপের মতই দেখতে। খাড়া নাক। বুদ্ধিদীপ্ত দুটো চঞ্চল চোখ। উদোম গা। পরনে লতাপাতার আচ্ছাদন। কাঁধ অবধি তেলহীন কটা রঙের চুল। বাপের পাশে এসে দাঁড়াল রোম।

কুয়াশা রোমের কাঁধে হাত রাখল, 'জোনজার ভয়ে পালিয়েছিলে বুঝি?'

'না,' রোম বুক ফুলিয়ে বলল, 'পালাইনি। বাবার হিকচিকরা আমাকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আপনি কে? ড. কুয়াশা?'

কুয়াশা মাথা নাড়ল।

রোম বলল, 'বাবা প্রায়ই আপনার কথা বলেন। আমার অ্যামবিশন কি ছিল জানেন?'

'কি?' দু'চোখে কৌতুক কুয়াশার। রোমকে বড় ভাল লাগছে তার। কাছে টেনে নিল সে রোমকে।

'আমার টারজান হবার ইচ্ছা ছিল,' বলতে লাগল রোম, 'কিন্তু বাবার কাছে আপনার কথা শুনতে শুনতে আমি এমনই মুগ্ধ হয়েছি যে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাকে আপনার মত হতে হবে।'

'আমি আশীর্বাদ করছি তুমি আমার চেয়ে অনেক বড় হও,' কুয়াশা হেসে ফেলে বলল।

গম্ভীর হয়ে উঠল রোম। গলা ভারি করে বলল, 'আমি জানি আপনার মত হতে চাওয়াটা সহজ নয়। সারাজীবন আমাকে সাধনা করতে হবে।'

কুয়াশা বলল, 'চেষ্টা করলে আমার চেয়ে বড় হতে পারবে তুমি, রোম।'

'হ্যাঁ, বাবা তাই বলেন।' রোম বলল, 'জানেন, জোনজাকে আমি একটুও ভয় করি না। ইচ্ছা করলে ওকে মেরে ফেলার একটা উপায় বের করতে পারি আমি। কিন্তু না, তা আমি সত্যি সত্যি পারি না। কেন জানেন? জোনজা আমার না হলেও, আপার বন্ধু ছিল। সেজন্যে আমি ইচ্ছা করলেও পারি না ওর কোন ক্ষতি করতে, তাছাড়া বাবা চান না...।'

কুয়াশা রোমের মাথার চুলে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার আপামণিকে তুমি বুঝি খুব ভালবাসো?'

'আমি আর কত ভালবাসি, আপা আমাকে অনেক বেশি ভালবাসে...।'

হঠাৎ মনোযোগ হারিয়ে ফেলল কুয়াশা রোমের উপর হতে। আড়চোখে তাকাল ও চারপাশে।

ভুরু কুঁচকে তাকাল কুয়াশা ড. মূরকোটের দিকে। ড. মূরকোট পিছন ফিরে তাকিয়ে আছেন।

উঠানের চারধারে জংলীদের ঘর। ঘরের ভিতর থেকে শত শত জংলী ঢাল তরোয়াল, বর্শা, তীর, ধনুক ইত্যাদি নিয়ে বেরিয়ে আসছে।

আস্তে আস্তে চারধার থেকে ঘিরে কুয়াশার দিকেই এগিয়ে আসছে জংলীরা।

'ব্যাপার কি?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

ড. মূরকোট ফিরে তাকালেন। বিস্মিত হয়েছেন তিনিও।

রোম অস্ফুটে বলে উঠল, 'বাবা!'

জংলীদের কারও মুখে কোন কথা নেই। তারা এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে। প্রত্যেকের চোখ-মুখ থমথম করছে। নিঃশব্দে, সরাসরি কুয়াশার দিকেই এগিয়ে আসছে সবাই।

লেসার গান এবং কাঁধের ব্যাগটার কথা মনে পড়ল কুয়াশার। ঘরের ভিতর ওগুলো আছে। দরকার পড়বে এখুনি হয়তো। কিন্তু নড়াচড়া করা কি উচিত হবে?

জংলীরা কি কুয়াশাকে শত্রু হিসেবে মনে করেছে?

ড. মূরকোট চিৎকার করে উঠলেন, 'আলখালনাল হিকচিক বাগডুম আগডুম। আম্পা জাম্পা মাল পো?'

হিকচিক মানে, জংলীদের ভাষায়, বন্ধু। জংলীদের সর্দারের উদ্দেশ্যে ড. মূরকোট বললেন, তারা কি তার নবাগত বন্ধুকে গ্রহণ করতে রাজি নয়? তারা কি তাকে হত্যা করতে চায়?

জংলীদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। তারা ভুলেও তাকাল না ড. মূরকোটের দিকে। শত শত জংলীর দৃষ্টি কুয়াশার উপর নিবদ্ধ। কেউ টুঁ শব্দটিও করল না। ড. মূরকোটের কথা যেন তারা শুনতেই পায়নি। সরাসরি এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে তারা।

অসহায়ভাবে তাকালেন ড. মূরকোট কুয়াশার দিকে। কুয়াশা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

'আগে কখনও তো এমন হয়নি। আমাকে এরা শ্রদ্ধা করে। আমাকে না জানিয়ে কিছুই করে না। সব ব্যাপারে আমার পরামর্শ নেয়। সর্দার আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

কথাগুলো বলে ড. মূরকোট আবার জংলীদের সর্দারের দিকে তাকালেন। তারপর চিৎকার করে বললেন, 'হাফুলা বাগডুম-আগডুম হিকচিক তেই তেই তেই দা তাপো তাপো। আমার বন্ধুর কোন ক্ষতি করতে পারবে না তোমরা। তার আগে আমাকে খুন করতে হবে।'

আশ্চর্য! ড. মূরকোটকে জংলীরা যেন চেনেই না। ফিরেও তাকাল না কেউ তার দিকে।

কাছে এসে পড়েছে জংলীরা চারধার থেকে। ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর। কি ঘটতে যাচ্ছে বলা যায় না। এতগুলো সশস্ত্র লোকের সাথে একা পেরে উঠবে না কুয়াশা। জংলীরা হঠাৎ যদি একযোগে আক্রমণ করে বসে তাহলে মৃত্যু অনিবার্য। অথচ অসভ্য, জংলী, বুনো লোকগুলোর আচরণের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা বুঝাতে না পারলেও অনুভব করে কুয়াশা খানিকটা যেন সাহস পাচ্ছিল মনে।

সর্দার হাত পাঁচেক দূরে থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাথে সাথে দাঁড়িয়ে পড়ল তার পিছনের এবং আশপাশের শত শত জংলী।

সর্দারের চেহারাটা ঋজু। সটান, বুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। কপালের মাঝখান থেকে সোজা নাকের শেষ প্রান্ত অবধি পাশাপাশি লাল এবং কালো আধ ইঞ্চি চওড়া রঙ মাখানো। ঠিক যেন লাল কালো ফিতে সেঁটে দেয়া হয়েছে। কপালের ডান এবং বাঁ পাশ থেকেও রক্তের ফিতে নেমে এসেছে দু'গাল বেয়ে চিবুক পর্যন্ত। সর্দারের গলায় মুক্তোর মালা। পরনে লতাপাতার বদলে পাটের দড়ি দিয়ে তৈরি আচ্ছাদন। সেটা পাঁচ রঙে রঙ করা। লাল, হলুদ, কালো, সবুজ, নীল।

সর্দারের হাতে লম্বা একটা বর্শা।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সর্দার কুয়াশার দিকে। তাকিয়ে আছে জংলীরা সবাই।

চঞ্চল হয়ে উঠেছেন ড.মৃরকোট। অসহায়ভাবে তিনি কুয়াশার দিকে একবার সর্দারের দিকে একবার তাকাচ্ছেন।

অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জংলী সর্দার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সামপা আমপা হিকলি চিপচা চিপচু। শোলক নোলক কড়কাড়া ছুঁ আবচা নাবচু। ইকলুম তা না না বিকলুম তা না না না।'

বিস্ময় ফুটে উঠল ড. মৃরকোটের চোখে মুখে। ঘাড় ফিরিয়ে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে চাইলেন তিনি।

কিন্তু বলা হলো না ড. মৃরকোটের। সর্দার এক লাফে কুয়াশার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

সর্দারের দেখাদেখি শত শত জংলী হুমড়ি খেয়ে পড়ল কুয়াশার উপর আচমকা

কুয়াশা কিছুই বুঝতে পারছিল না।

সর্দার কোমর থেকে পাথরের ধারাল একটা ছোট অস্ত্র বের করে কুয়াশার মুখের সামনে তুলে ধরে বিড়বিড় করে কি যেন বলল। তারপর সেই অস্ত্র দিয়ে কেটে ফেলল তার হাতের খানিকটা মাংস। রক্ত বেরিয়ে এল কাটা জায়গা দিয়ে সবেগে সেই রক্ত ডান হাতের চেটোয় নিল সর্দার। তারপর হঠাৎ, বলা নেই কওয়া নেই হাত তুলে ঢেলে দিল কুয়াশার মাথার মাঝখানে।

বিড়বিড় করে মন্ত্র উচ্চারণ করছে শত শত জংলী। যাদের মন্ত্র উচ্চারণ শেষ হয়েছে তারা নিজের শরীরের বিভিন্ন জায়গা কেটে রক্ত নিয়ে কুয়াশার মাথায় ঢালছে।

প্রমাদ গুণল কুয়াশা। জংলীদের এই অদ্ভুত আচরণের কোন কারণ সে বুঝতে পারল না। কিন্তু ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সবগুলো জংলী যদি এভাবে তার মাথায় রক্ত ঢালতে থাকে তাহলে রক্তে ভেসে যেতে হবে তাকে।

ড. মৃরকোট পাশেই ছিলেন। কিন্তু তাকে কোথাও দেখতে পেল না কুয়াশা। সর্দারও কখন যেন অদৃশ্য হয়েছে।

চারদিক থেকে প্রচণ্ড চাপ অনুভব করছে কুয়াশা। অবশ্যি একটি জিনিস লক্ষ করল সে জংলীরা চেষ্টা করছে যাতে তার গায়ে ধাক্কা না লাগে। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। চারদিক থেকে ধাক্কা খাচ্ছে কুয়াশা। অস্বাভাবিক শক্ত মানুষ সে, তাই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে এখনও।

কুয়াশার মাথা, কপাল, গলা, কাঁধ, বুক, পিঠ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু এমন উদ্ভট সমস্যায় পড়েও হাসি পেল তার।

যদিও হাসি ফুটল না কুয়াশার ঠোঁটে। হঠাৎ যে ভয়ানক গম্ভীর হয়ে উঠল ভারি গলায় সে বলে উঠল, 'সরে যাও তোমরা সবাই। অনেক হয়েছে, আর নয়।'

থমকে দাঁড়াল জংলীরা। কেউ এক চুল নড়ল না আর। এতটুকু শব্দ করল না।

সর্দারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'চামুক চামুক হুকড়া ভোলতাজ।'

পরমুহূর্তে প্রচণ্ড উল্লাসে হর্ষধ্বনি করে উঠল শত শত জংলী। আনন্দে নাচতে নাচতে কুয়াশার কাছ থেকে সরে যেতে লাগল তারা।

এদিক-ওদিক তাকাতে কুয়াশা দেখল ড. মূরকোট, রোম এবং সর্দার এগিয়ে আসছে তার দিকে। রোম দাঁত বের করে হাসছে।

সবচেয়ে আগে কাছে এসে দাঁড়াল রোম। কুয়াশার রক্ত মাখা হাতটা ধরে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমাদের জংলীরা আপনাকে তাদের পূর্বপুরুষদের দেবতা বলে মনে করছে। তাদের ধারণা আপনি পুনর্জন্ম লাভ করে ওদের মঙ্গল করার জন্যে সৃষ্টিকর্তার তরফ থেকে এসেছেন।'

ড. মূরকোট পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'ওরা যা বলে তাই মেনে নেন, ড. কুয়াশা। এরা আপনার ওপর সরল বিশ্বাস পোষণ করছে তা ভেঙে দেয়ার চেষ্টা করবেন না। ভয়ানক আঘাত পাবে তাতে। ওরা মনে করবে তাহলে সৃষ্টিকর্তা ওদের ওপর সন্তুষ্ট নন। আর একবার এ-ধরনের চিন্তা ওদের মনে জাগলে কি কাণ্ড শুরু হবে জানেন?'

রোম বলল, 'আপনি তা কল্পনাও করতে পারবেন না, ড. কুয়াশা। ওরা সবাই আত্মাহুতি দেবে আগুনে।'

'হ্যাঁ,' বললেন ড. মূরকোট, 'সবাই আত্মহত্যা করে নিজেদের গোটা অস্তিত্বই নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বে।'

কুয়াশা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল জংলী সর্দারের দিকে। কথা সরল না তার মুখে।

জংলী সর্দার ড. মূরকোটের উদ্দেশ্যে কি যেন বলল।

ড. মূরকোটও কি যেন বললেন জংলী সর্দারকে। তারপর কুয়াশার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'সর্দার জানতে চাইছে তারা যে আপনাকে তাদের পূর্বপুরুষদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলে মনে করছে, তা কি সত্যি?'

উত্তর দিতে পারল না কুয়াশা। প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছে তার। কিন্তু হেসে ফেলাটা চরম বোকামি হবে মনে করে নিজেকে সামলে রাখল সে। মৃদুস্বরে বলল, 'কাজটা কি উচিত হচ্ছে?'

ড. মূরকোট জংলীদের ভাষায় সর্দারকে আবার কি যেন বললেন।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল প্রৌঢ় সর্দার। ড. মূরকোট জানিয়ে দিয়েছেন উত্তর। সর্দারকে তিনি বলেছেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের ধারণাই ঠিক।'

সর্দারকে নাচতে দেখে শত শত জংলী ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করে দিল।

পরিবেশ স্বাভাবিক হতেই কাজ এবং কর্তব্যের কথা মনে পড়ল কুয়াশার। ড. মূরকোটকে বলল, 'জংলীদেরকে বলুন তাদের সামনে ভীষণ বিপদ। তারা যেন কিছু দিনের জন্যে আনন্দ উৎসব বিসর্জন দেয়। এখন কাজের সময়। মন দিয়ে কাজ

করলে বিপদ কেটে যাবে।'

ড. মূরকোট সর্দারকে কথাগুলো জানালেন। সর্দারের নির্দেশে জংলীরা নাচ থামিয়ে চুপ করে দাঁড়াল।

কুয়াশা বলল, 'আমাকে পানির ব্যবস্থা করে দিতে বলুন। শক্ত সমর্থ দশজন লোককে তৈরি হতে বলুন। ডেভিডের আস্তানায় হামলা চালাতে হবে।'

ড. মূরকোটের মুখ থেকে কুয়াশার আদেশ-নির্দেশ শুনল সর্দার।

কুয়াশা ড. মূরকোটকে বলল, 'আপনি এইবার আহত জংলীদেরকে কোন একটি ঘরের ভিতর নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। যারা আহত হয়েছে তাদেরকে দেখাশোনা না করলে এমনিতেই মারা যাবে। আর এক দলকে নির্দেশ দিন মৃত দেহগুলোর সদগতি করার।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে স্নান সেরে নতুন একটি টকটকে লাল আলখাল্লায় নিজেকে আবৃত করল কুয়াশা। খানিক পরই ড. মূরকোটের সাথে ল্যাবরেটরিতে ঢুকল সে।

ভিতরে পা ফেলেই থমকে দাঁড়াল কুয়াশা।

'কি হলো, ড. কুয়াশা?' প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ মূরকোট।

'আমার ব্যাগ আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু লেসার গানটা এখানেই ছিল সেটা দেখছি না।'

রোম বাবার নির্দেশে একছুটে ডেকে আনল জংলী সর্দারকে।

সর্দারকে ব্যাপারটা ড. মূরকোট বললেন। সর্দার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলো। যে চুরি করেছে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেল সর্দার ড. মূরকোটের ঘর থেকে।

কিন্তু জংলীদের মধ্যে কেউ স্বীকার করল না চুরির কথা। এমনকি কেউ দেখেওনি জিনিসটা কারও হাতে।

কুয়াশাকে ভয়ানক চিন্তিত দেখাল। ড. মূরকোটকে সে বলল, 'শত্রুর হাতে ওটা যদি পড়ে তাহলে নির্ঘাৎ মৃত্যু হবে আমাদের। পৃথিবীর যাবতীয় মারাত্মক মারণাস্ত্রের মধ্যে আমার ওই লেসার গানটাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। ওটার ক্ষমতা কল্পনাতীত। যার হাতে পড়বে, সে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষকে হত্যা করতে পারবে অনায়াসে। পাহাড়কে চোখের পলকে ছাই করে দেয়া যায় ওটা দিয়ে। নদীকে শুকিয়ে ফেলা যায় আধমিনিটের মধ্যে। আমার কি ধারণা জানেন?'

'কি, ড. কুয়াশা?'

'জংলীদের মধ্যে কেউ একজন বিশ্বাসঘাতক আছে। যে ডেভিডের হয়ে কাজ করছে। লেসার গানটা সে-ই চুরি করেছে। এতক্ষণে সেটা নিশ্চয়ই ডেভিডের হাতে পৌঁছে গেছে।'

'তাহলে উপায়?'

'এক মুহূর্ত দেরি না করে এখুনি ডেভিডের আস্তানা আক্রমণ করা উচিত। খোঁজ নিয়ে দেখুন তো আমার সঙ্গী ডেভিডের যে দুজন লোককে আহত করেছিল তাদের রাইফেল দুটো আছে কি না?'

রাইফেল তিনটেই পাওয়া গেল। অতিরিক্ত রাইফেলটা রাসেল ফেলে গেছে।

সর্দারের অনুমতি পেতে এক সেকেণ্ডও দেরি হলো না। দশজন মাত্র লোক চাইল কুয়াশা। কিন্তু প্রায় শ' দুয়েক জংলীকে নিয়ে সর্দারও চলল কুয়াশার পিছু পিছু।

ড. মূরকোট রইলেন গ্রামেই। তাঁর সাথে রইল কয়েকজন মাত্র জংলী আহতদেরকে দেখাশুনা করার জন্যে।

কুয়াশার ডান পাশে জংলী সর্দার। বাঁ পাশে জোশান রোম। রোমের হাতেও একটি রাইফেল। চালাতে জানে সে। রোম এবং কুয়াশা ছাড়া আর কেউ রাইফেল চালাতে জানে না।

জংলীরা পিছনে। তারা নিঃশব্দে অনুসরণ করছে ওদের তিনজনকে। তাদের কাঁধে তীর ধনুক। হাতে বুমেরাং বা বর্শা।

পিছনের দশ বারোজন জংলীর কাছে ঢাক-ঢোল দেখতে পেয়ে রোমকে কুয়াশা বলল, 'সর্দারকে বলো ঢাক-ঢোল যেন ভুলেও না বাজানো হয়।'

যুদ্ধ যাত্রার অপরিহার্য অঙ্গ ঢাক-ঢোল। কিন্তু দেবতার ইচ্ছাই চরম ইচ্ছা। সর্দার নির্দেশ দিল। দশ বারোজন জংলী দাঁড়িয়ে পড়ল। এগিয়ে চলল অন্যান্যরা।

শত্রুদের আস্তানা দূর থেকেই দেখা গেল। কুয়াশা নির্দেশ জারি করার আগেই জংলীরা যে-যার ইচ্ছা মত তীর এবং বর্শা ছুঁড়ে মারতে শুরু করল। বিরক্ত বোধ করল কুয়াশা।

কুয়াশা সর্দারকে কিছু বলার জন্যে থামতেই শত্রুদের পক্ষ হতে গর্জে উঠল একজোড়া রাইফেল।

বুকে গুলি খেয়ে বাঁকা হয়ে গেল দুজন জংলীর দেহ। পড়ে গেল তারা সশব্দে। কুয়াশার নির্দেশ সর্দারকে জানিয়ে দিল রোম।

সর্দার জংলীদের মধ্যে আদেশ জারি করল। জংলীরা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করল দ্রুত। কুয়াশা জংলীদেরকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে শুরু করল কিভাবে আক্রমণ করতে হবে, কিভাবে গা-ঢাকা দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে ইত্যাদি। সর্দার গম্ভীর ভাবে ধমক মারছে জংলীদেরকে। গাছের মগডালে গিয়ে উঠে পড়েছে রোম। কুয়াশা শত্রুদের বাড়ির ছাদের দিকে তাকাল। হঠাৎ চারদিক সচকিত করে দিয়ে শব্দ হলো রাইফেলের। হঠাৎ ছিটকে পড়ে গেল কুয়াশা। পরমুহূর্তে অদূরে প্রচণ্ড শব্দে ফাটল একটি হ্যাণ্ডগ্রেনেড।

ডি.কস্টা সহাস্যে যুবতী কুমারীদের গালে চুমো খেতে লাগল।

জোনজা যখন জংলীদের গ্রামে হামলা চালিয়েছে, ডি.কস্টা তখন সর্দারের সাথে শুয়োরের কলিজা ভাজা, টিকটিকির লেজ সেদ্ধ, বানরের মগজ, ক্যাঙ্গারুর কোর্মা, ঈমুর রোস্ট, তেলেপোকা এবং কাঠপিঁপড়ের আচার সহকারে বৈকালিক নাস্তা সারছিল।

জোনজার আগমন বার্তা শোনার সাথে সাথে সর্দার ছুটে বেরিয়ে পড়ে তার ঘর থেকে। ডি.কস্টাও বেরোয়। তবে খানিক পর অভুক্ত যাবতীয় খাবার একটা পুটলিতে বেঁধে দু'মিনিট পরই সে হাজির হয় সর্দারের কাছে।

সর্দার তখন গ্রামের যুবতী এবং কুমারী মেয়েদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। কথা হলো ফললার নেতৃত্বে মেয়েরা গ্রাম থেকে দূরে একটি উঁচু গাছের মাথায় যে ঘরখানি আছে সেখানে যাবে।

ফললা হলো গ্রামের অন্যতম বীরদের একজন। ডি.কস্টার সাথে তার বনিবনা হয় না।

সেই মুহূর্তে ফললা সেখানে উপস্থিত ছিল না। সর্দার গেল তাকে খুঁজতে। এই ফাঁকে ডি.কস্টা মেয়েদেরকে বলল, 'তোমরা হামার সাথে যাইটে রাজি আছ কি? হামি টোমাডের শাসক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। টোমাডের ভাল মণ্ড ডেখিবার ডায়িট্ট হামার উপরই। তাছাড়া তোমরা কালা আদমী, মাঠায় বুড্ডি নাই, আছে ওনলি গোবর—বাট হামি আংরেজের জাট, টোমাডেরকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন হামার এক পূর্ব পুরুষ, জেমস কুক—সুতরাং টোমরা ফললার বডলে হামার সাটে যদি যাইটে রাজি ঠাকো টো বলো...।'

মেয়েরা ডি.কস্টার কথা না বুঝলেও ভাব ভঙ্গি দেখে প্রশংসা না করে পারল না। তাছাড়া সাদা চামড়ার লোকদের প্রতি তাদের এমনিতেই একটা শ্রদ্ধা এবং সমীহ ভাব আছে। ডি.কস্টার মনোভাব বুঝতে পেরে কেলকেলা এবং চুলচুলা নামে দুটি কুমারী রাজি হয়ে গেল। তাদের দেখাদেখি বাকি সব মেয়েরাও বেরিয়ে এল গ্রাম থেকে ডি.কস্টার পিছু পিছু।

মোট তেরোজন কুমারী মেয়েকে নিয়ে বীরদর্পে এগিয়ে চলল ডি.কস্টা জঙ্গলের ভিতর দিকে। চুলচুলা কয়েকবার ডি.কস্টাকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে সর্দার তাদেরকে যেখানে আশ্রয় নিতে বলেছে সেখানে যাবার পথ এটা নয়।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। ডি.কস্টা কারও কথায় কান দিল না। হাঁটতেই লাগল সে।

মেয়েদের সবাই কুমারী বলে তাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাব ফুটে

উঠল। ডি.কস্টাকে স্বামী হিসেবে পেলে বর্তে যাবে তাদের মধ্যে যে-কেউ। ফলে কেউ ডি.কস্টার ইচ্ছায় বাদ সাধল না।

কিন্তু সবকিছুরই তো একটা সীমা আছে। হাঁটার অভ্যাস থাকলেও উদ্দেশ্যহীন ভাবে মেয়েরা বেশিক্ষণ হাঁটবে কেন? এদিকে সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। সাত মাইলের মত হেঁটে এসেছে সবাই ইতিমধ্যে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে দেখে মনে মনে ডি.কস্টাও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না সে। এখন আর গ্রামের দিকে ফিরে যাবার মানে হয় না। পথেই রাত্রি নামবে। গর্ত থেকে বের হবে হিংস্র নেকড়ে, ধূর্ত হায়েনা, বিষাক্ত সাপ। এদিকে সবাই অস্ত্রহীন।

নিজেকে মনে মনে গালাগালি করছিল ডি.কস্টা। বড় ভুল করে ফেলেছে সে। মেয়েদের মন জয় করার আনন্দে বেমালুম ভুলে গিয়েছিল সে পৃথিবীর যাবতীয় কথা।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ডি.কস্টা। মেয়েগুলো বড় দুষ্ট তো! পিছন থেকে চাপা স্বরে সবাই হাসছে। ফিসফিস করছে।

কারণ কি? ওদের মনে কি ভয় বলতে কিছু নেই? ঘুরে দাঁড়াল ডি.কস্টা। মেয়েগুলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল সে।

চাপা উল্লাস মেয়েদের চোখেমুখে। আশায় আনন্দে সবাই অধীর হয়ে উঠেছে। ডি.কস্টা বোকার মত তাকিয়ে রইল। হঠাৎ চার-পাঁচজন মেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার উপর।

'টোমরা হামাকে ঢাক্কা মারিটেছ কেন? হোয়াট্স্ দ্য ম্যাটার? টোমরা…।'

কথা শেষ করার অবকাশ ওরা দিল না ডি.কস্টাকে। কেউ ধরল ডি.কস্টার হাত, কেউ জড়িয়ে ধরল সরু কোমরটা, কেউ ধরল তার শার্টের কোণা। প্রায় হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল সবাই তাকে।

মেয়েদের নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সাথে পরস্পরের কেমন যেন একটা রেষারেষির সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল হঠাৎ। তর্ক করছে তারা তাদের দুর্বোধ্য ভাষায়। সবাই ছুঁতে চায় ডি.কস্টাকে। একজন আরেকজনকে ল্যাং মেরে ধরাশায়ী করার চেষ্টা করছে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে গালাগালি করছে কেউ কেউ।

কি যে আসলে ঘটছে তা বুঝতেই পারল না ডি.কস্টা। বিড় বিড় করে সে বলতে শুরু করল, 'গড আমার সহায় হোন।'

মিনিট তিনেক পর দেখা গেল জঙ্গলের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড ঘর।

ঘরটাকে দেখে আনন্দে উল্লাসে মেয়েরা চিৎকার করে উঠল। অথচ ডি.কস্টা ঘরের সামনে কাউকে দেখতে পেল না।

ঘরের সামনে এসে মেয়েরা দাঁড়াল। শক্ত লতা দিয়ে দরজা বাঁধা। সেটা খোলা হলো। ঘরের ভিতর সদলবলে একযোগে ঢুকল মেয়েরা ডি.কস্টাকে নিয়ে। ঘরের ভিতর লতাপাতা দিয়ে তৈরি কয়েকটা লম্বা লম্বা বাক্স এবং মেঝেতে পাতা

দিয়ে তৈরি করা বিছানা ছাড়া আর কিছু নেই।

ঘরের ভিতর ঢুকে মেয়েদের রহস্যময় আচরণ আরও চরম আকার ধারণ করল।

ডি.কস্টাকে ছেড়ে দিয়ে মেয়েরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল বাক্সগুলোর উপর। কে কার আগে বাক্স খুলতে পারে তারই যেন প্রতিযোগিতা চলছে।

পালাবার এই সময়!

ডি.কস্টা ভাবল মেয়েরা হয়তো তার উপর খেপে গেছে কোন কারণে। জংলী মেয়ে, বাপরে বাপ! এদের দ্বারা অসম্ভব কিছু নেই।

কি আছে বাক্সের ভিতর? তীর ধনুক? হত্যা করতে চায় নাকি মেয়েগুলো তাকে?

পালাতে হবে।

কিন্তু বাইরের দিকে তাকিয়ে প্রাণ বাঁচাবার শেষ এবং একমাত্র উপায়টাও গ্রহণযোগ্য বোধ হলো না ডি.কস্টার। সন্ধ্যা নেমেছে। বাইরে, অদূরেই, শোনা যাচ্ছে হায়েনার ভয়ানক হাসি এবং নেকড়ের কর্কশ হুঙ্কার।

না, পালানো চলবে না। এই ঘর থেকে বের হলেও হজম করে ফেলবে হিংস্র জন্তু জানোয়াররা।

মেয়েদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে গেছে।

জংলী মেয়ে। অসভ্য! সভ্য জগতের যে কোন পুরুষের চেয়ে বেশি শক্তি এক একটির শরীরে। বাক্স খোলা নিয়ে তারা পরস্পরের সাথে মারামারি করতে শুরু করেছে। বড় ভয়ানক দৃশ্য।

দাঁতে দাঁত চেপে প্রকাণ্ড দেহী মেয়েগুলো পরস্পরের উপর হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। চুলোচুলি, ঘুষোঘুষি, হাতাহাতি চলছে। প্রায় উলঙ্গ মেয়েরা কেউ কারও সাথে পেরে উঠছে না। তবে মারামারি করার ফাঁকে সবাই চেষ্টা করছে বাক্সগুলো খোলার।

অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে শুধু একটার পর একটা চিমটি কাটছে ডি.কস্টা। চিমটি কাটার ব্যথায় চোখ মুখ বিকৃত হয়ে উঠছে তার। তবু সে তার সামনের দৃশ্যকে সত্য বলে মেনে নিতে পারছে না। তার ধারণা এসব ঘটছে স্বপ্নে।

মিনিট পাঁচেক পর দুটো মেয়ে তড়াক করে লাফাতে লাফাতে এসে পড়ল ডি.কস্টার উপর। ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল ডি.কস্টা। কিন্তু মেয়েগুলোর সেদিকে খেয়াল নেই। তাদের দুজনের হাতে দুটো ফুলের মালা। দুজনেই ভূপাতিত স্যানন ডি.কস্টার গলায় মালা দুটো পরিয়ে দেবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একটি মেয়ে ধপাস্ করে বসল ডি.কস্টার পাঁজর বের হওয়া বুকে। মট্ করে একটা শব্দ হলো। দ্বিতীয় মেয়েটি বসল ডি.কস্টার মাথার পিছনে। ডি.কস্টার হাতটা পিছন দিকেই ছিল। সেটার উপর বসল মেয়েটি। আঙুল মটকে শব্দ হলো।

ডি.কস্টা ভাবল তার পাঁজরের হাড় ভেঙে গেছে।

হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলল ডি.কস্টা। এমন সময় মেয়ে দুটো উঠে দাঁড়াল। পরমুহূর্তে দেখা গেল আরও তিন চারজন ঝাঁপিয়ে পড়ছে ডি.কস্টার উপর।

মেয়েগুলো নির্মমভাবে ডি.কস্টার মাথায়, বুকে চেপে বসে তার গলায় মালা পরিয়ে দিতে লাগল। প্রায় পনেরো মিনিট পর দেখা গেল মি. স্যানন ডি.কস্টা নড়াচড়া করছে না। জ্ঞান হারিয়েছে সে।

প্রত্যেকটি মেয়ে ডি.কস্টার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছে। ফুলের মালায় ঢেকে গেছে অচেতন ডি.কস্টার মুখ এবং বুক। মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে, বসে আছে তাকে ঘিরে।

খানিক পর জ্ঞান ফিরল ডি.কস্টার। কিন্তু দম ফেলতে পারল না। হাত দিয়ে ফুলের মালা সরিয়ে পিট পিট করে তাকাল সে। মনে মনে একটু সাহস হলো। জংলী মেয়েগুলো শান্ত হয়ে গেছে।

উঠে বসল ডি.কস্টা। মেয়েরা একযোগে আনন্দ ধ্বনি করে উঠল। বোকার মত তাকিয়ে রইল ডি.কস্টা। তারপর নিজের গলার মালাগুলো দেখিয়ে ইঙ্গিতে জানতে চাইল, 'এগুলো কেন?'

চুলচুলা কিছু কিছু ইংরেজি জানে। কারণ সে ড. মূরকোটের ঘর পরিষ্কার করার কাজে নিযুক্ত গত কয়েক বছর ধরে। ড. মূরকোটের কাছ থেকে ইংরেজি কিছু কিছু শিখেছে সে।

ডি.কস্টার জ্ঞাতার্থে চুলচুলা জানাল জঙ্গলের ভিতর এই ঘরটা আসলে তাদের সমাজের অত্যন্ত পবিত্র স্থান। জংলীদের মধ্যে অবিবাহিত কোন পুরুষ এবং কুমারী নারী যদি এই ঘরে এক রাত কাটায় তাহলে ধরে নিতে হবে তারা পরস্পরকে বিয়ে করল। এই ঘরে রোজ তাজা ফুলের মালা রেখে যাওয়া হয়। যে কোন একটি কুমারী মেয়ে এবং কুমার পুরুষ এই ঘরে ঢুকে রাত কাটাতে পারে। নিয়ম অনুযায়ী মেয়ে পুরুষকে মালা পরিয়ে দেবে। ব্যস, তাহলেই তারা স্বামী-স্ত্রী হয়ে গেল।

চুলচুলা আরও কয়েকটা কথা জানাল। ডি.কস্টাকে স্বামী হিসেবে চেয়েছিল তারা সবাই—গ্রামের কুমারী মোট তেরোজন মেয়েই। প্রত্যেকেই ডি.কস্টাকে মালা পরিয়েছে। এবং তারা প্রত্যেকে আজ রাতটা এই ঘরে ডি.কস্টার সাথে কাটাবে। তারমানে তেরোজন মেয়েরই স্বামী হতে যাচ্ছে ডি.কস্টা।

সব কথা জানতে পেরে গলা শুকিয়ে গেল ডি.কস্টার। আবার জ্ঞান হারাবে বলে ভয় হলো তার। মনে মনে সে ভাবল টেরোজন বড় বড় আনম্যারেড উওম্যান আর টাহাডের স্বামী সে একা।

নিয়মানুযায়ী খুলে নেয়া হলো ডি.কস্টার পরনের সব পোশাক। পরিয়ে দেয়া হলো লতা পাতার তৈরি কোমর বন্ধনী। একদল মেয়ে তার গায়ের সাথে চোখ ঠেকিয়ে দেখতে লাগল সাদা চামড়া। মশালের ধোঁয়ায় ঘর ভরে যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে কারও খেয়াল নেই। কেউ কেউ শুঁকছে নাক ঠেকিয়ে ডি.কস্টার গায়ের

গন্ধ। হাত দিয়ে পরখ করছে কেউ কেউ তার শরীর। আর একদল মেয়ে ডি.কস্টার মুখে লাল কালো রং মাখিয়ে দিচ্ছে।

আরও পনেরো মিনিট পর মেয়েরা ঘিরে বসল ডি.কস্টাকে। এবার তারা ডি.কস্টাকে বিশেষ ধাক্কা টাক্কা মারল না। একে একে, বেশ সুশৃংখল ভাবে তারা চুমো দিতে লাগল ডি.কস্টার কপালে।

সহাস্যে দাঁত বের করে, ঠোঁটের দুই প্রান্ত কান অবধি নিয়ে গিয়ে, তেরোজন বউয়ের আদর নিতে থাকল ডি.কস্টা। জীবনটা দারুণ মধুর বলেই মনে হলো তার।

তিন

ঝড়ের সাথে পাল্লা দিয়ে দৌড়ে কি কেউ কোনদিন পেরেছে?

ছুটন্ত ঘোড়ার মত দ্রুত পা ফেলে মরিয়া হয়ে ছুটছে রাসেল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দৌড়াবার চেষ্টাটাই হাস্যকর। কিন্তু জোনজার ভ্রূক্ষেপ নেই কোন দিকে। ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে সে।

এখনও বিকট স্বরে কেঁদে উঠছে জোনজা। ভিষণ ভয় পেয়েছে সে। ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে দূরে, বহুদূরে। গাছের সাথে ধাক্কা খাচ্ছে ঘনঘন, ঝোপের সম্মুখীন হচ্ছে, হাত পা ছিঁড়ে যাচ্ছে বুনোগাছের কাঁটা লেগে। কিন্তু ছোটার বিরাম নেই তবুও।

রাসেলেরও সেই একই অবস্থা। সামনের সব বাধাকে তুচ্ছ করে জোনজাকে অনুসরণ করে চলেছে সে। দু'এক মিনিট পরপরই চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে জোনজা। কিন্তু তবু পিছু ছাড়ছে না রাসেল। অনুমানের উপর নির্ভর করে ছুটেই চলেছে সে।

আকারে ছোট, অপেক্ষাকৃত কম হিংস্র বুনো জীব-জানোয়াররা সন্ধ্যার আগে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে যাচ্ছে। খানিক পরই রাত নামবে। গর্ত থেকে বের হবে হিংস্র মাংশাসী, ভয়ংকর জীব-জন্তু। তাসমানিয়ান ডেভিল পড়ল সামনে হঠাৎ। আতঙ্কে বোকার মত থমকে দাঁড়াল সে। কিন্তু রাসেলকে মানুষ হিসেবে চিনতে পেরেই বাদামী জিভ বের করে ঠোঁট চেটে নিল সে। প্রায় চব্বিশ ইঞ্চি লম্বা নেকড়ের মত দেখতে ভয়ানক হিংস্র জানোয়ারটি লাফ দিয়ে ধরতে গেল রাসেলের একটি পা। রাসেল দেখতেই পায়নি তাকে। যেমন ছুটছিল তেমনি ছুটতে লাগল ও। মিনিট খানেক রাসেলকে অনুসরণ করে দাঁড়িয়ে পড়ল তাসমানিয়ান ডেভিল। নাহ, মানুষটার জানের মায়া আছে! কি রকম দৌড়াচ্ছে হরিণের মত! অন্য শিকারের উদ্দেশ্যে একটি ঝোপের ভিতর ঢুকে গেল সে।

সন্ধ্যার সময় হারিয়ে ফেলল রাসেল জোনজাকে।

প্রায় মাইল দশেক দৌড়ে এসেছে সে। হঠাৎ আতঙ্কিত বোধ করল রাসেল। সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই পকেটের ছোট ছুরিটা ছাড়া। জংলীদের গ্রামে ফিরে যাওয়া

এখন আর সম্ভব নয়। রাত নামছে অচেনা অজানা গহন অরণ্যে।

জোনজাকে অনুসরণ করার পিছনে বড় একটি কারণ ছিল রাসেলের। জোনজা ভয় পেয়েছে তাও বুঝতে পেরেছিল। জোনজা যখন ছুটে পালাতে শুরু করল তখন কেন যেন ওর মনে হলো যে ফোমের কাছেই যাবে সে। ফোমকে জঙ্গলের কোন গোপন জায়গায় রেখেছে জোনজা এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তাকে অনুসরণ করতে শুরু করেছিল রাসেল। ফোমকে উদ্ধার করা দরকার।

কিন্তু জোনজার পিছু পিছু প্রায় দশমাইল এসে রাসেলের হঠাৎ মনে হলো ফোমকে এত দূরে নিশ্চয়ই রাখেনি সে।

নানা দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ল রাসেল। কুয়াশা নিশ্চয়ই তার খোঁজে লোক পাঠাবে। মনে পড়ল, কুয়াশা পিছন থেকে নিষেধ করেছিল রাসেলকে জোনজার পিছু না ধরতে।

সকাল হবার আগে কেউ খুঁজে পাবে না ওকে। অবশ্য যদি ও সকাল অবধি বেঁচে থাকে। রাসেল বুঝতে পারল হিংস্র জীব জানোয়ারে ভর্তি অচেনা অজানা এই গহীন অরণ্যে নিরস্ত্র অবস্থায় একা রাত কাটানো অসম্ভব। নির্ঘাৎ মৃত্যু ঘটবে।

জোনজাকে হারিয়ে ফেলার পর আর ছুটছে না ও। কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকারও কোন মানে হয় না। গাছের উপর চড়ে রাতটুকু নিরাপদে কাটাবার চেষ্টা করতে হবে।

উঁচু একটা অচেনা গাছে চড়ল রাসেল। গাছের মগডালে উঠে দিনের শেষ অস্পষ্ট আলোয় এদিক ওদিক তাকাতেই একটি মাটির ঢিবি দেখতে পেল রাসেল অদূরে। জোনজাকে দেখল ও মাটির ঢিবির নিচে একটি মাঝারি আকারের গুহায়।

গুহা মুখের সামনে হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে আছে জোনজা। গুহার ভিতরটা গাছের মাথা থেকে দেখতে পাচ্ছে না রাসেল পরিষ্কার। তবে মাঝে মাঝে মাথা তুলে জোনজা গুহার ভিতর কি যেন দেখছে।

কেউ আছে কি গুহার ভিতর?

প্রশ্নটা মনে জাগতেই ফোমের কথা মনে পড়ে গেল রাসেলের, 'কেন যেন হঠাৎ আশঙ্কায় ভরে উঠল ওর বুক।'

দ্রুত সন্ধ্যা নামছে। অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। ফোম যদি গুহার ভিতর থাকে···। আর যেন ভাবতে পারে না রাসেল।

জোনজা উঠে বসছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাসেল। অবাক হলো ও। জোনজা হাত নেড়ে কাকে যেন ডাকছে। গুহার ভিতর কেউ আছে।

কয়েক সেকেণ্ড পরই সব সন্দেহের অবসান ঘটল? গুহার ভিতর থেকে গুহামুখে বেরিয়ে এল ফোম।

ফোমের পরনে রাসেলের দেয়া বুক খোলা শার্টটা'ই দেখা যাচ্ছে। আবছা আলোতেও রাসেল দেখতে পেল, ভয়ে আতঙ্কে চুপসে গেছে ফোমের মুখ।

জোনজার সামনে এসে দাঁড়াল ফোম। ফোমকে বসতে বলল সামনে জোনজা। আতঙ্ক ফুটে উঠল ফোমের হাবভাবে। কি যেন বলল সে।

হঠাৎ গর্জন করে উঠল জোনজা।

কেঁপে উঠল ফোম। আস্তে আস্তে বসল সে জোনজার সামনে। জোনজা দু'হাত দিয়ে ধরল ফোমকে। প্রকাণ্ড একটা দৈত্য যেন কোলে তুলে নিল একটা পুতুলকে।

ফোমকে কোলে নিয়ে আদর করতে শুরু করল জোনজা। গাল ঘষছে সে ফোমের মাথায়, গালে, গলায়।

চমকে উঠল রাসেল। সর্বশরীর হিম হয়ে গেল তার হঠাৎ। চিৎকার করছে ফোম। নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে জোনজার হাত থেকে।

জোনজা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরছে ফোমকে। ফোমের মুক্তি পাবার কোন আশা নেই।

জোনজা ফোমের তরফ থেকে বাধা পেয়ে আরও মরিয়া এবং উত্তেজিত হয়ে উঠল। শক্ত করে ফোমকে চেপে ধরেছে সে নিজের বুকের সাথে। জোর করে ফোমের মুখটা নিজের মুখের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

গহীন অরণ্যে ফোমের তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার অটুট নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দিচ্ছে।

তরতর করে গাছ থেকে নামতে শুরু করল রাসেল। কিছু একটা করা দরকার। চুপচাপ বসে দেখতে পারবে না ও জোনজার হাতে একটি অসহায় মেয়ের মৃত্যু।

গাছ থেকে নামতেই অদূরে কোথাও থেকে হুঙ্কার ছাড়ল একটি নেকড়ে। চমকে উঠে পিছন দিকে তাকাল রাসেল। দেখা যাচ্ছে না নেকড়েটাকে। নেকড়েটা হয়তো দেখতে পাচ্ছে তাকে।

দ্রুত চিন্তা করল রাসেল। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারল না। ওর এক হাতে একটা গাছের মোটা ভারি ডাল। অপর হাতে ছোট ছুরিটা। মাটির ঢিবির দিকেই পা বাড়াল রাসেল। খানিকটা দূরে শোনা গেল নেকড়ের ডাক। পিছন দিক থেকে এল ডাকটা। প্রথম নেকড়েটাই শিকারকে দেখতে না পেয়ে দূরে গিয়ে ডাকছে কিনা বুঝতে পারল না রাসেল।

কয়েক পা এগোবার পরই জোনজাকে এবং ফোমকে দেখতে পেল রাসেল।

একইভাবে সমানে চিৎকার করে চলেছে ফোম। ব্যথা পাচ্ছে সে জোনজার অত্যাচারে।

একপা দু'পা করে, সন্তর্পণে, নিঃশব্দে জোনজার দিকে এগিয়ে চলল রাসেল। আস্তে আস্তে জোনজার ঠিক পিছনে গিয়ে দাঁড়াল ও।

পিছন ফিরে তাকাল জোনজা। রাসেল ওর ডান হাতের মোটা ভারি ডালটা সর্বশক্তি দিয়ে বসিয়ে দিল জোনজার কপালে।

বিকট স্বরে গর্জন করে উঠল জোনজা।

যে-কোন স্বাভাবিক মানুষকে ওরকম একটা আঘাত করলে সেই মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করত সে। কিন্তু জোনজার কপালে এতটুকু আঁচড় অবধি কাটল না।

গর্জে উঠেছে জোনজা রাগে। ফোমকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

রাসেল আবার প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ চালাল। দু'হাত দিয়ে ডালটা ধরে জোনজার মাথা লক্ষ্য করে আঘাত হানল ও। কিন্তু খপ করে ধরে ফেলল জোনজা ডালটা। সেটাকে ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। তারপর দাঁত মুখ বিকৃত করে অবোধ্য একটা চিৎকার করে দমাদম ঘুসি মারল নিজের বুকে।

হঠাৎ জোনজা পা বাড়াল রাসেলের দিকে।

রাসেল পিছিয়ে আসছে।

দ্রুত করল জোনজা তার হাঁটা। রাসেল হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল। রাসেলকে ধরার জন্যে এবার ছুটতে শুরু করল জোনজাও।

ক্যাঙ্গারুর মত বড় বড় কয়েকটা লাফ দিয়ে চোখের পলকে সামনেরই একটা ঝোপের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল রাসেল।

ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দ্রুত দিক পরিবর্তন করে আগের সেই উঁচু গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল।

মাত্র বিশ-পঁচিশ হাত দূরে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে জোনজাকে। ঝোপের ভিতর খুঁজছে সে রাসেলকে।

দ্রুত গাছে চড়তে শুরু করল রাসেল। প্রায় দু'মানুষ সমান উঁচুতে উঠে গেল রাসেল। হঠাৎ এদিকে তাকাল জোনজা। বিকট স্বরে হুঙ্কার ছাড়ল সে। লাফাতে লাফাতে গাছটার দিকে ছুটে আসতে দেখা গেল তাকে।

উঁচু গাছটার প্রায় মগডালে উঠে এল রাসেল। ছোট ছুরিটা বের করে শক্ত করে ধরে রেখেছে সে হাতে। এই একটি মাত্র অস্ত্র তার। জোনজার হাত থেকে এই ছুরির সাহায্যে রেহাই পাবার কোন আশা নেই জানে রাসেল। তবু প্রাণ বাঁচাবার জন্যে চেষ্টার ক্রটি করবে না সে।

গাছ বেয়ে উঠে আসছে জোনজা। প্রকাণ্ড ভারি দেহটা নিয়ে উঠতে অসুবিধে হচ্ছে তার। কিন্তু কোন কিছুতেই পিছিয়ে যেতে রাজি নয় সে। শত্রুর রক্ত না দেখা অবধি তার প্রাণ ঠাণ্ডা হবে না।

আরও একটু উপরে উঠে গেল রাসেল। ক্রমশ উপরে উঠে আসছে জোনজা। আতঙ্কিত হয়ে উঠল রাসেল।

হঠাৎ জোনজা তাল হারিয়ে ফেলল।

রাসেল সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে।

দু'ইঞ্চি ডায়ামিটারের একটা ডালে পা রেখেছে জোনজা। ডাল ভাঙার শব্দ

হচ্ছে। জোনজার দেহের ভার ডালটা সহ্য করতে পারছে না।

ডালটা ভেঙে গেল। সশব্দে গাছের নিচে পড়ল জোনজা সাড়ে তিন মানুষ সমান উঁচু থেকে।

কিছুই হলো না জোনজার। গাছ থেকে পড়ে মাটিতে বসে পড়েছিল সে। তখুনি উঠে দাঁড়াল। একটি সেকেণ্ডও নষ্ট করল না জোনজা। চিন্তা-ভাবনারও চেষ্টা করল না সে। উঠে দাঁড়িয়েই গাছের গোড়ায় আবার চলে এল। মাথা তুলে তাকাল রাসেলের দিকে। মাথার উপর রাসেল। গাছটার খানিকটা পুব দিকে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় রাত্রিকালীন গভীর অরণ্য বড় রহস্যময় লাগছে। গাছের মোটা কাণ্ডে দুটো হাত রাখল জোনজা।

অবাক বিস্ময়ে দমবন্ধ করে রাখল রাসেল পাঁচ সেকেণ্ড। জোনজা গাছের গায়ে ধাক্কা দিয়ে গাছটাকে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে!

বিস্ময়ের ঘোর কাটল রাসেলের পরমুহূর্তে। বিপদ টের পেল ও। গাছটা নড়ছে। একটু একটু হেলে পড়ছে।

সর্বশক্তি দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে জোনজা গাছে। গাছ নুইছে। থরথর করে কাঁপছে সরু ডাল পালা, পাতা।

দুরু দুরু করছে রাসেলের বুক। জোনজাকে বোকা মনে করা সত্যিই বোকামি হবে। প্রচণ্ড অমানুষিক শক্তি ওর গায়ে, সেই সাথে বুদ্ধিটাও পাকা।

ঘন জঙ্গল। গাছগুলোর ডালপালা পরস্পরের সাথে গা ঠেকিয়ে আছে। এক গাছ থেকে আরেক গাছে যাওয়াটা খুব একটা কঠিন হবে না। মেপে, হিসেব করে সাবধানে পা রাখল রাসেল একটা সরু ডালে।

সরু ডাল। রাতের আঁধারে ভাল দেখাও যাচ্ছে না। ডালটা দুর্বল হলে, পোকায় খাওয়া হলে কিছু বুঝতে না দিয়ে মট করে ভেঙে পড়বে। রক্ষা নেই ভাঙলে। নিচে জোনজা তৈরি হয়েই আছে। স্রেফ ধরে ফেড়ে ফেলবে। কিন্তু তার আগেই বারোটা বেজে যাবে তার। প্রায় তিন তলা একটা বাড়ির সমান উঁচুতে এখন সে। নিচে পড়লে ভর্তা হয়ে যাবে শরীর।

তাল সামলে এক ডাল থেকে আর এক ডালে যাওয়া কষ্টকর হয়ে উঠেছে। গাছটা নুয়ে পড়ছে কাঁপতে কাঁপতে। পা সিধে রাখতে পারছে না রাসেল।

আস্তে আস্তে এক ডাল থেকে আরেক ডালে পা রাখছে। মিনিট কয়েক পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ও।

দ্বিতীয় একটা গাছের ডালে চলে এসেছে ও।

প্রথম গাছটা নুয়ে পড়ছে দ্রুত। মোটা গাছটার গোড়া ভাঙছে সশব্দে।

দেখতে দেখতে প্রকাণ্ড গাছটা সশব্দে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

গাছটাকে ধরাশায়ী করে খুঁজতে শুরু করল জোনজা। রাসেলকে না পেয়ে বিকট স্বরে গর্জে উঠল সে। তারপর আবার উপর দিকে তাকাল।

রাসেলকে দেখে দমাদম ঘুসি মারল সে নিজের বুকে।

একদল নেকড়ে ডেকে উঠল কাছেই একটা ঝোপের পাশ থেকে। লাফিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়াল জোনজা।

নেকড়ের দলটিকে গাছের উপর থেকে দেখতে পেয়ে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল রাসেল। জোনজার মনোযোগ তার উপর থেকে সরে যাবে এখন।

নেকড়ের দলে চারটে নেকড়ে। জোনজার প্রকাণ্ড দেহটা দেখে হঠাৎ আক্রমণ করার সাহস পাচ্ছে না তারা। ধারাল দাঁত বের করে ডাক ছাড়তে ছাড়তে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তারা।

জোনজা সেই একই ভাবে গর্জন করছে। হঠাৎ সে ঝাঁপিয়ে পড়ল নেকড়ের দলের উপর।

দুটো নেকড়ে বিপদ টের পেয়ে পিছন ফিরে ছুট দিল। বাকি দুটো পালাবার সময় পেল না।

জোনজা দুটো নেকড়েকে ধরল দু'হাত দিয়ে। শূন্যে তুলে অবলীলাক্রমে সে ছুঁড়ে দিল নেকড়ে দুটোকে দূরে।

মাটিতে পড়েই ছুট দিল তারা।

রাসেলের দিকে তাকাল জোনজা। বুকে আবার দমাদম শব্দে ঘুসি মারতে লাগল। কিন্তু এবার সে কোন শব্দ উচ্চারণ করল না। গাছের নিচে বসল সে আস্তে আস্তে।

এদিক-ওদিক তাকাল রাসেল। ঘন অন্ধকার চারদিকে। মাটির ঢিবিটা এখন আর দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে।

রাসেলের দৃষ্টি আটকে গেল প্রথম গাছটার উপর। যে গাছটা ছেড়ে সে খানিক আগে দ্বিতীয় গাছটায় চলে এসেছে। গাছটার উপর বড়সড় একটা জন্তুকে দেখে কেঁপে উঠল রাসেলের বুক।

জন্তুটা এগিয়ে আসছে রাসেলের দিকেই।

'কি ওটা?'

অনুমান করে চেনার চেষ্টা করল রাসেল।

'ভাল্লুক?'

খুব সম্ভব। অস্ট্রেলিয়ান ভাল্লুক সম্পর্কে বইয়ে পড়েছে রাসেল। বড় ভয়ঙ্কর হয় এরা। যার পিছনে লাগে তাকে শেষ না করে পিছু হটে না। হয় মারে, নয় মরে।

গাছের পাতার ফাঁক গলে ছোট ছোট চাঁদের আলোর টুকরো যা আশপাশে এসে পড়েছে তাতে জন্তুটাকে পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে না।

হাতের ছুরিটা বাগিয়ে ধরে ঢোক গিলল রাসেল। নতুন এই বিপদ থেকে প্রাণ বাঁচাতে পারবে কি সে?

পাঁচ হাত সামনে চলে এসেছে জন্তুটা সন্তর্পণে। এগিয়ে আসছে সে।

হঠাৎ রাসেলের পিছন থেকে ডেকে উঠল একটি নেকড়ে। চমকে উঠে গাছ থেকে পড়ে যাচ্ছিল রাসেল। কোনক্রমে তাল সামলে একটা ডাল ধরে ফেলল ও।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না রাসেল।

আবার ডেকে উঠল নেকড়েটা। ভয়ে আতঙ্কে নির্জীবের মত বসে রইল রাসেল। গাছে চড়েছে একটা নেকড়ে। মাত্র হাত পাঁচ ছয় দূর থেকে হুঙ্কার ছাড়ছে সে। অন্ধকারে সে হিংস্র জানোয়ারটাকে দেখতে না পেলেও তাকে জানোয়ারটা ঠিকই দেখতে পাচ্ছে।

কুয়াশার কথা মনে পড়ে গেল রাসেলের। তার এই চরম বিপদে একমাত্র পরম উপকারী বন্ধু হতে পারে কুয়াশা।

কুয়াশার মধ্যে মানবতা আছে। তার বিপদে সে প্রাণ বিপন্ন করে বাঁচাবার চেষ্টা করবে তাকে।

কিন্তু কুয়াশা কি জানে তার এই বিপদের কথা?

আবার গর্জে উঠল নেকড়েটা।

পিছনদিকে তাকাতে সাহস পেল না রাসেল। সামনের জন্তুটা থমকে গেছে। মাত্র হাত চারেক দূরে সে। এবার হয়তো লাফ দিয়ে রাসেলের উপর পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে।

নিচের দিকে তাকাল রাসেল। জোনজা মাথা তুলে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

চার

জংলীরা বোবা বনে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। রাইফেলের শব্দ হতেই কুয়াশা ছিটকে পড়ে গেছে মাটিতে। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দে একটা গ্রেনেড ফাটল কুয়াশার কাছ থেকে মাত্র হাত পনেরো দূরে।

কুয়াশা নড়ছে না।

এক মুহূর্ত পর জংলীরা গগনবিদারী কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। যে যার আশ্রয় ছেড়ে ছুটে আসতে শুরু করল কুয়াশার দিকে। দেবতা আহত হয়েছে দেখে শোকে দিশেহারা সবাই।

সর্দারও সব ভুলে হাপুস নয়নে কাঁদছে। গলা ফাটিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে শোক প্রকাশ করছে সে।

গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল। মাথা তুলে তাকাল কুয়াশা।

জংলীদেরকে ছুটে আসতে দেখে দ্রুত উঠে দাঁড়াল সে। জংলীরা বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে হর্ষধ্বনি করে উঠল।

ধমকে উঠল কুয়াশা বজ্রকণ্ঠে। ইঙ্গিতে সকলকে আত্মগোপন করার হুকুম দিল সে। রাইফেলের শব্দ হয়েছিল ঠিক। কিন্তু গুলি কুয়াশাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়নি।

সুতরাং রাইফেলের গুলিতে আহত হবার প্রশ্নই ওঠে না তার।

ছিটকে পড়ে গিয়েছিল কুয়াশা ইচ্ছে করেই। শত্রুপক্ষ তাদের বাড়ির ছাদের উপর থেকে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ছে দেখতে পেয়েই আত্মরক্ষার স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী শুয়ে পড়েছিল সে।

সময় মত শুয়ে না পড়লে কুয়াশাকে খুঁজে পাওয়া যেত না।

কুয়াশা সবার আগে। তার পিছনে জংলীরা। কয়েকটা ঝোপের ভিতর গোঙাচ্ছে কয়েকজন। রাইফেলের গুলিতে তারা আহত হয়েছে। কুয়াশা নির্দেশ দিল আহতদেরকে গ্রামে পৌঁছে দিতে। তারপর নির্দেশ দিল আক্রমণ করার।

দেবতার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে জংলীরা তীর ছুঁড়তে লাগল শত্রুপক্ষের বাড়ির দরজা জানালা লক্ষ করে।

কুয়াশা তার ব্যাগ থেকে বের করল ছোট দুটো গোল যন্ত্র। চিনেমাটির মারবেলের মত দেখতে ওগুলো। দাঁত দিয়ে গোল জিনিস দুটোর গা থেকে দ্রুত দুটো ক্ষুদ্র পেরেক তুলে নিল সে। তারপর একটি একটি করে ছুঁড়ে দিল শত্রুদের বাড়ির দিকে।

চোখের পলকে অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটে গেল।

গোটা বাড়িটা দেখতে না দেখতে গাঢ় রঙের ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল।

জংলীরা সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল। দেবতা তার কেরামতি দেখাতে শুরু করেছে, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না তাদের।

গোটা বাড়িটা ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যেতে কুয়াশা সর্দারকে ইঙ্গিতে ডাকল। সর্দার এগিয়ে আসছে।

রোমকে নিচে নামতে বলল কুয়াশা। রোম দ্রুত নেমে এল নিচে। কুয়াশার পাশে এসে দাঁড়িয়ে কৌতূহল মেটাবার জন্যে সে প্রশ্ন করল, 'ব্যাপার কি, ডক্টর কুয়াশা? কি ছুঁড়ে মারলেন আপনি।'

মৃদু হেসে কুয়াশা বলল, 'সামান্য দুটো বোমা ছুঁড়ে মেরেছি। আমার ল্যাবে তৈরি। বাড়ির ভিতর যারা আছে তারা যদি মুখোশ ব্যবহার না করে তাহলে জ্ঞান হারাবে।'

আনন্দে উত্তেজনায় হাততালি দিয়ে উঠল রোম।

কুয়াশা বলল, 'রোম, তুমি সর্দারকে বলো সে যেন তার লোকদেরকে জানিয়ে দেয় ধোঁয়া বাতাসে উড়ে না যাওয়া অবধি কেউ যেন ওদিকে পা না বাড়ায়।'

রোম নির্দেশ পালন করল।

কুয়াশা ধোঁয়ায় ঢাকা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল তার লেসার গানের কথা।

শত্রুপক্ষ লেসার গান ব্যবহার করেনি। তবে কি তাদের হাতে পড়েনি জিনিসটা? কোনও জংলী কৌতূহল বশত সেটা চুরি করে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে?

লেসার গান ছাড়া এই বিপদসঙ্কুল অরণ্যে নিজেকে দুর্বল লাগল কুয়াশার। তা বিশেষ দুশ্চিন্তা শত্রুপক্ষকে নিয়ে।

তাদের হাতে যদি লেসার গানটা পড়ে এবং তারা যদি ওটা ব্যবহার করা কলাকৌশল শিখে ফেলে, তাহলে মহা বিপদ আছে কপালে।

ধোঁয়া সরে যাচ্ছে।

অধীর হয়ে উঠছে জংলীরা।

রোম হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'ডক্টর কুয়াশা!'

রোমের দিকে ঝট করে তাকাল কুয়াশা। রোম তাকিয়ে আছে আকাশে দিকে।

পক্ষীরাজ ঘোড়াটাকে অনেক উঁচুতে এক মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল কুয়াশা।

শত্রুপক্ষ পালাচ্ছে নিরাপদে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আবার একবার দেখ গেল যান্ত্রিক ঘোড়াটাকে। পরিষ্কার দেখা গেল ঘোড়ার পেটের কাছের একটা খোল জানালা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে লেসার গানের লম্বা, সরু চকচকে ইস্পাতে ব্যারেলটা।

ধোঁয়া সরে যেতে বাড়ির ভিতর ঢুকল কুয়াশা সর্দার এবং রোমকে সাথে নিয়ে জংলীরা রইল বাড়ির চারদিকে।

বাড়ির ভিতর রাইফেলের গুলিতে নিহত তিনজন শ্বেতাঙ্গকে পাওয়া গেল ছাদের উপর পাওয়া গেল বাকি চারজনকে। বিষাক্ত তীর বিদ্ধ হয়ে মারা গেছে তারা।

পালিয়েছে কেবল ডেভিড। পালের গোদা ডেভিড বুদ্ধিমান এবং চতুর লোক বুঝতে পারল কুয়াশা। তা না হলে সময় মত পালাতে পারত না সে।

জংলীরা বাড়ির যাবতীয় জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল গ্রামের দিকে কুয়াশার নির্দেশে। সর্দার ও কুয়াশা ফিরে চলল গ্রামের দিকে।

তখন সন্ধ্যা হবো হবো।

গ্রামে ফিরে এসে সর্দার গেল মেয়েদের খোঁজ খবর নিতে। কুয়াশা জংলীদে বিচারালয়ে ঢুকল। ড. মূরকোট সেখানে আহত জংলীদের চিকিৎসা করছেন।

একা পেরে উঠছিলেন না বৃদ্ধ। কুয়াশা তাঁকে দম ফেলার ফুরসত দিয়ে দায়ি নিল চিকিৎসার। দ্রুত অপারেশন করে ছয়জন জংলীর শরীর থেকে মোট নয়টা বুলে বের করল সে। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে জোনজা কর্তৃক আহত জংলীদের ক্ষতস্থা পরীক্ষা করতে শুরু করল কুয়াশা। কিন্তু কাজের মাঝপথে বাধা পড়ল।

ঝড়ের বেগে বিচারালয়ে প্রবেশ করল জংলী সর্দার।

দেবতা অর্থাৎ কুয়াশার সামনে হাঁটু ভেঙে নামাজ পড়ার ভঙ্গিতে বসে সর্দা উত্তেজিত গলায় দুর্বোধ্য ভাষায় কি সব বলতে লাগল।

সর্দারের কথা শেষ হতে ড. মূরকোট কুয়াশাকে সর্দারের বক্তব্য বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'গতকাল একজন বাঙালী অ্যাঙলো এই গ্রামে এসেছিল। লোকটা নিজের পরিচয় দেয় আপনার বন্ধু বলে। নাম বলে স্যানন ডি. কস্টা তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কখন থেকে?'

ডি. কস্টা বেঁচে আছে মনে মনে ধারণা করেছিল কুয়াশা। পক্ষীরাজ ঘোড়া তাদের ইয়টে নেমেছিল এবং কোন না কোন ভাবে ডি. কস্টা তাতে চড়ে ইয়ট থেকে উড়ে এসেছে—বুঝতে পারল কুয়াশা।

'জোনজা গ্রাম আক্রমণ করার পর থেকেই।'

ড. মূরকোট আবার বলতে শুরু করলেন, 'ফললা নামে এক জংলী বীরের ওপর দায়িত্ব ছিল গ্রামের সব কুমারী যুবতী মেয়েদেরকে গ্রাম থেকে খানিক দূরে একটা নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাবার। কিন্তু ফললা মেয়েদেরকে দেখতেই পায়নি। তখন থেকে সে মেয়েদেরকে খুঁজছে। গ্রামে বা গ্রামের আশপাশে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। কিন্তু কোথাও নেই তেরোজন মেয়ে। সেই সাথে আপনার সঙ্গী স্যানন ডি. কস্টাকেও পাওয়া যাচ্ছে না। ফললা যেখানে মেয়েদেরকে নিয়ে যাবে স্থির হয়েছিল সেখানেও লোক পাঠিয়ে দেখা হয়েছে। কেউ নেই সেখানে।

কুয়াশাকে চিন্তিত দেখাল। মেয়েগুলোর নিখোঁজ হওয়ার সাথে ডি. কস্টার অদৃশ্য হবার যে একটা সম্পর্ক আছে তা অনুমান করতে পারল সে। কিন্তু আসলে কি ঘটেছে তা ভেবে পেল না।

কুয়াশা প্রশ্ন করল, 'রাসেল ফেরেনি?'

'না,' ড. মূরকোট জানালেন।

এদিকে রাত নেমেছে বনভূমিতে।

কুয়াশা পরামর্শ দিল সশস্ত্র কয়েকটি দল কয়েক দিকে যেন এখুনি ওদের খোঁজে রওনা হয়ে যায়।

কুয়াশার হুকুম অনুয়ায়ী কাজ হলো।

রাত আটটা অবধি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইল সবাই। কিন্তু ফিরল না কেউ। মেয়েরাও ফিরল না, ডি. কস্টাও ফিরল না, ওদেরকে যারা খুঁজতে গেছে তাদের কোন দলও ফিরল না।

রাত সাড়ে আটটার সময় সশ্রদ্ধভঙ্গিতে সর্দার অনুরোধ করল খাওয়াদাওয়া সেরে নিতে।

ড. মূরকোট, রোম এবং কুয়াশা চলল সর্দারের বাড়ির দিকে।

ড. মূরকোটের জন্যে আলাদা রান্নাবান্নার ব্যবস্থা চালু আছে। সর্দার তাদের দেবতার জন্যেও আলাদা রাঁধতে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল।

বুনো হাঁসের রোস্ট, যবের রুটি ও গরুর দুধ পান করে আহার শেষ করল

ওয়া।

রাত বারোটা অবধি গল্পগুজব চলল। ড. মূরকোট জানালেন পঙ্খীরাজ ঘোড়া
তাঁর নিজেরই তৈরি।

সর্দার ড. মূরকোটকে বলল, 'পঙ্খীরাজ ঘোড়া নিয়ে উত্তর দিকে উড়ে গে
ডেভিড।'

চমকে উঠলেন ড. মূরকোট।

কুয়াশা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে তিনি বিচলিত গলায় বললেন, 'উত্তর দি
জঙ্গল খুব বেশি দূর নেই। জঙ্গলের শেষে গ্রেট ভিক্টোরিয়ার মরুভূমি। মরুভূমি
উপর পাহাড় শ্রেণী। পাহাড় শ্রেণীর পর আবার মরুভূমি। এই পাহাড়ে বাস ক
ভয়ঙ্কর পিশাচ হাহা জাতি। হাহারা পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্ঠুর লোক। আজ অব
তাদের ওদিক থেকে কেউ জ্যান্ত ফিরে আসতে পারেনি। দেখামাত্র ধরে বলি দে
তাদের ধর্ম। ডেভিডকে হাহারা খুব ভয় করে। কারণ পঙ্খীরাজ ঘোড়া আমার কা
থেকে কেড়ে নিয়ে ওদের এলাকায় গিয়েছিল। হাহারা সেটা দেখে খুব ভয় পায়
তবে ডেভিড ওদের কোন ক্ষতি করেনি। ডেভিড যদি ওদের ওখানে গিয়ে আশ্রয় নে
তাহলে বড় বিপদের কথা।

কুয়াশাকেও চিন্তিত মনে হলো। খানিক পর সে প্রশ্ন করল, 'আপনি আমা
বালির নমুনা পাঠিয়েছিলেন কোথা থেকে নিয়ে?'

'ডেভিডের সাথে গ্রেট ভিক্টোরিয়ার মরুভূমিতে গিয়েছিলাম আমি। হাহাদে
পাহাড় ছাড়িয়ে আরও মাইল ত্রিশেক দূরে ওই বালি সংগ্রহ করি আমি। ডেভি
আমাকে নিয়ে গিয়েছিল পঙ্খীরাজে চড়িয়ে।'

কুয়াশার গলায় বিস্ময়, 'আপনি বলতে চান ডেভিডের সাথে তখন আপনা
সম্পর্ক ভাল ছিল?'

'ভাল ছিল! বলেন কি! আপনি বালি চেয়ে মেসেজ পাঠাবার সাথে সাথে সে
কথা জানতে পারে ডেভিড। তখন ডেভিডের হাতে বন্দী আমি। ডেভিড আমা
চাপ দিচ্ছে জোনজাকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্যে। জোনজাকে ত্রুটিমুক্ত করা হলে
সুপারম্যান তৈরি করার ফর্মুলাটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবার পরিকল্পনা ছি
তার। কিন্তু আমি ত্রুটিমুক্ত করতে সফল হতে পারছিলাম না। ডেভিড অবশ্যি ত
বিশ্বাস করেনি। তার ধারণা আমি ইচ্ছা করে জোনজাকে ত্রুটিমুক্ত করিনি।
ব্যাপারে আমাকে সে মারধরও করেছে।'

ড. মূরকোট দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার বলতে শুরু করলেন, 'শে
অবধি সে আমাকে জিজ্ঞেস করল জোনজাকে ত্রুটিমুক্ত করা আমার দ্বারা সম্ভ
কিনা। আমি বললাম—না, আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তবে একজনের দ্বারা সম্ভব। তি
হলেন ড. কুয়াশা। ডেভিডের সাথে আমার এ কথা হবার তিনদিন পর আপনা
মেসেজ এল। সে-খবর স্বভাবতই জানত ডেভিড। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে বালি সংগ্র

করে দিল আমাকে। এরপর একদিন একটা সুযোগ পেয়ে আপনাকে মেসেজ পাঠালাম সকলের অজ্ঞাতে। তারপর ডেভিড আপনাকে একটা মেসেজ পাঠাতে নির্দেশ দিল। তার সামনে দাঁড়িয়ে আবার একটা মেসেজ পাঠালাম।'

কুয়াশা বলল, 'আপনার মেসেজের পরস্পর বিরোধিতা দেখেই আমি বুঝতে পারছিলাম আপনি কোন জটিল বিপদে পড়েছেন।'

'বিপদ বলে বিপদ। স্বচক্ষেই তো সব দেখেছেন। জোনজাকে কি ত্রুটিমুক্ত করা সম্ভব, ডক্টর কুয়াশা?'

চিন্তিত ভাবে কুয়াশা বলল, 'সম্ভব, ডক্টর মূরকোট, অবশ্যই সম্ভব।'

'আপনি পারবেন?'

আশায় আনন্দে বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর দু'চোখের কোনে জল এসে পড়ল।

'চেষ্টার ত্রুটি করব না, ড. মূরকোট। এবং চেষ্টা করে আজ অবধি কোন কাজে আমি ব্যর্থ হইনি। এখন সবচেয়ে আগে দরকার জোনজাকে ধরে আনা।'

বৃদ্ধ বললেন, 'সে দায়িত্বও আপনাকে নিতে হবে, ডক্টর কুয়াশা। জোনজার জন্যে রাতে আমি ঘুমাতে পারি না আজ মাসখানেক ধরে। তার ওপর ফোমকে নিয়ে প্রায়ই সে পালাচ্ছে। ওরা ছোটবেলা থেকে বন্ধু ছিল। দু'জন দু'জনকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারত না। মাত্র বছর দুয়েকের বড় জোনজা আমার ফোমের চেয়ে। জোনজা সর্দারের ছেলে, তা নিশ্চয়ই জানেন?'

বৃদ্ধের চোখ থেকে টপটপ করে দু'ফোঁটা জল পড়ল।

কুয়াশা বলল, 'আপনি মুষড়ে পড়লে চলবে না, ড. মূরকোট। ধৈর্য ধরুন। আমি যখন এসে পৌঁছেছি তখন আপনার কোন ভয় নেই।'

খানিক পর আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। হাহাদের সম্পর্কে সব কিছু জানতে চাইল কুয়াশা। ড. মূরকোট বলতে শুরু করলেন।

হাহাদের সম্পর্কে শুনতে শুনতে কুয়াশার মত অসমসাহসী বীরও শিউরে উঠল। হাহারা ভয়ঙ্কর নরমাংসভক্ষণকারী অসভ্য জাতিদের মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র এবং দুর্ধর্ষ তাতে কোন সন্দেহ রইল না কুয়াশার।

মনে মনে সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করল সে। হাহাদের এলাকা পেরিয়েই তাকে যেতে হবে ইউরেনিয়ামের সন্ধানে।

রাত গভীর হয়েছে। মধ্যরাত্রি পেরিয়ে যাবার পর সর্দার কুয়াশাকে তার জন্যে নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে দিল।

কুমারী মেয়েরা, ডি. কস্টা বা তাদেরকে খুঁজতে গেছে যারা তারা কেউ ফিরে আসেনি তখনও।

পাঁচ

তখনও সূর্য ওঠেনি। তবে সকাল হয়েছে। হৈ-চৈ-এর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল

কুয়াশার। বিছানা ছেড়ে উঠে বসল ও। ডি. কস্টার গম্ভীর গলা শোনা যাচ্ছে, 'উহাডের কোই ডোষ নাই! উহাডেরকে টরচার করিবেন না, প্লীজ! টাহা ছাড়া উহারা অবলা মেয়েলোক। টাহাছাড়া উহারা বর্টমানে হামার ওয়াইফ···।'

হেসে ফেলল কুয়াশা। উঠে দাঁড়িয়ে আলখাল্লাটা পরে দরজার দিকে এগোল।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে কিন্তু কুয়াশার হাসি উবে গেল এক মুহূর্তে।

উঠানে জংলীদের ভিড়। সর্দারকেও দেখা যাচ্ছে। রোম দাঁড়িয়ে রয়েছে সর্দারের পাশেই। ড. মূরকোটকে কোথাও দেখতে পেল না কুয়াশা।

উঠানের শিশির ভেজা মাটিতে সারবন্দীভাবে শুইয়ে রাখা হয়েছে পাশাপাশি তেরোজন মেয়েকে। প্রতিটি মেয়ের হাত পা চেপে ধরেছে কয়েকজন করে শক্ত সমর্থ পুরুষ।

প্রতিটি মেয়ের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে একজন করে জংলী ধারাল এক একটা অস্ত্র নিয়ে কি যেন করছে। ডি. কস্টা সর্দারের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। দ্রুত সেদিকে পা বাড়াল কুয়াশা।

কুয়াশাকে দেখে জংলীরা আনন্দ-ধ্বনি করে উঠল। কিন্তু যে-যার কাজ থেকে বিরত হলো না।

কুয়াশা মেয়েগুলোর মাথার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রতিটি মেয়ের সামনের দুটো করে দাঁত অস্ত্র দিয়ে ঘা মেরে তুলে ফেলা হচ্ছে।

কুয়াশা রোমকে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, রোম?'

রোম কুয়াশার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'মি. ডি. কস্টা গ্রামের তেরোজন কুমারী মেয়েকে গতরাতে বিয়ে করেছেন। নিয়ম মত বিয়ের আগে মেয়েদের একটি করে দাঁত তুলে নিতে হচ্ছে। কোন মেয়ে যদি বিয়ের আগে দাঁত তুলে নেবার কাজটা না সারে তাহলে বিয়ের পরদিনই তার দুটো দাঁত তুলে নেবার নিয়ম আছে।'

ডি. কস্টা লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে কুয়াশার দিকে। সর্দারও আসছে।

'মি. কুয়াশা।' করুণ কণ্ঠে ডেকে উঠল ডি. কস্টা।

'বলুন।' একটু যেন বিরক্ত হলো কুয়াশা।

বিপদে পড়লে ডি. কস্টা কুয়াশাকে স্যার স্যার করে অস্থির হয়ে পড়ে।

'হামাকে, স্যার, ওরা বিপদে ফেলে দিয়েছে, স্যার!' ডি. কস্টা বলতে শুরু করল, 'হামাকে নাকি একডজন একটা হাহা খুন করতে হবে। তা না হোলে হামাকে উহারা জ্বলন্ত আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ওনলি ডশডিনের টাইম ডিটে চাইছে সড্ডার, স্যার। স্যার, হাপনি হামাকে বাঁচান, স্যার! হাপনার ডুটো পায়ে ঢরি!···'

ডি. কস্টা নিচু হলো কুয়াশার পা জড়িয়ে ধরার অভিপ্রায়ে।

কড়া একটা ধমক দিল কুয়াশা, 'চুপ করে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ান। যা জিজ্ঞেস করব তার বেশি একটাও কথা বলবেন না।'

কুয়াশা রোমের দিকে তাকাল। বলল, 'সর্দারের বক্তব্য কি জিজ্ঞেস করো তো, রোম।'

সর্দার জানাল তাদের পূর্ব পুরুষদের দেবতা ছিলেন আলআলতালা। আলআলতালাই নতুন করে জন্মলাভ করে তাদের মাঝখানে এসেছেন। প্রাচীন যুগে স্বয়ং আলআলতালা যে আইন প্রণয়ন করেছিলেন সেই আইনই আজ অবধি চালু আছে। সুতরাং দুইটার বেশি বিয়ে করলে সেই আইন অনুযায়ী যে শাস্তি ডি. কস্টার পাবার কথা তাই সে পাবে বলে সর্দারের ধারণা।

জংলীরা কুয়াশাকে আলআলতালা নামে দেবতা বলে মনে করছে।

কুয়াশা খানিকক্ষণ চিন্তা করল। সর্দার যে শাস্তি ডি. কস্টাকে দিয়েছে তা বদলাতে গেলে জংলীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। এদিকে দশ দিনের মধ্যে তোরোজন হাহাকে হত্যা করাও ডি. কস্টার পক্ষে অসম্ভব। একজন হাহাকে হত্যার করার চেষ্টা করতে গেলেও হাহারা ডি. কস্টাকে ধরে জীবন্ত অবস্থায় ছিঁড়ে কাঁচা খেয়ে ফেলবে। হাহারা সাধারণত তাই করে।

কুয়াশা আরও খানিকক্ষণ চিন্তা করে সর্দারকে জানাল, 'ডি. কস্টাকে এক মাসের সময় দেয়া যেতে পারে। এবং এরপর থেকে সমাজে কেউ দুটোর বেশি বিয়েই করতে পারবে না। যে করবে তাকে বের করে দেয়া হবে সমাজ থেকে। পুরানো আইন আজ থেকে বাতিল হলো। আগুনে নিক্ষেপ করার চেয়ে সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেয়াটাই উচিত শাস্তি।'

সর্দার দেবতার সমাজ সংস্কারের নমনীয় পদ্ধতি দেখে আনন্দে হর্ষধ্বনি করে উঠল।

ডি. কস্টা কুয়াশার ধমক ভুলে গিয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু, স্যার, হামি ওনলি ওয়ান মান্থের মড্যেই বা কি করে একডজন এঁকটা হাহা খুন করিব, স্যার?'

কুয়াশা বলল, 'কি করে করবেন তা আমি কি জানি। বিয়ে যখন করতে পেরেছেন তেরোজন মেয়েকে তখন তেরোজন হাহাকেই বা খুন করতে পারবেন না কেন?'

রোম ডি. কস্টার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি সময় নষ্ট করবেন না, মি. ডি.। এখানকার নিয়ম আপনি জানেন না। জানলে এক সেকেণ্ড নষ্ট করার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। সন্ধ্যার আগে অবধি কি কি কাজ সারতে হবে আপনাকে জানেন?'

'কি?' ঢোক গিলে জানতে চাইল ডি. কস্টা।

'তেরোজন মেয়ের গুরুজন আপনাকে তেরোটা শুয়োর ছানা দেবে। সেগুলোকে জবাই করে ছাড়িয়ে ধুয়ে লবণ দিয়ে পোড়াতে হবে। তেরোজন মেয়ের ছাব্বিশটা দাঁত পাথর দিয়ে গুঁড়িয়ে আটার মত করে তেরোজন মেয়ের মা খালার মাথায় ছড়িয়ে দিয়ে আপনি চলে যাবেন পাহাড়ী নদীতে। নদী সাঁতরে ওপারে যেতে

হবে। সেখান থেকে মাটি নিয়ে এসে মেয়েদের মা-খালার মাথায় মাখিয়ে ধুইয়ে দিতে হবে। নতুন কোমর-বন্ধনী তৈরি করতে হবে চোদ্দটা। একটা অবশ্য আপনার নিজের জন্যে। বাকিগুলো আপনার স্ত্রীদের। সেগুলো আপনারা পরবেন সন্ধ্যার পর। সন্ধ্যার পরে খাওয়া দাওয়া পরিবেশন করবেন আপনি। গ্রামের প্রতিটি লোককে পেট ভরে খাওয়াতে হবে। তারপর আর কোন কঠিন কাজ আপনাকে করতে হবে না। তবে নাচতে হবে আগামীকাল সকাল অবধি।'

ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ডি. কস্টার মুখ। কুয়াশার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে করুণ কণ্ঠে সে বলতে লাগল, 'স্যার, এবারের মত আমাকে মাফ করে ডিন, স্যার। সর্দারকে বুঝিয়ে নিয়ে আপনি একটা ব্যবস্থা করুন। তা'না হলে আপনি অনুমতি ডিন, স্যার, পালিয়ে যাই ইয়টে···।'

কুয়াশা আবার ধমকে উঠল, 'খবরদার! পালাবার চেষ্টা করবেন না। সে চেষ্টা করলে ওরা মেরে ফেলবে আপনাকে। যা যা করতে হবে শুরু করুন। সব কাজ শেষ করতে না পারলে সর্দারকে বুঝিয়ে বলব আমি। কিন্তু সব কাজ যাতে শেষ হয় সেই চেষ্টাই করুন।'

রোমকে কুয়াশা পাঁচটা ঘোড়া সংগ্রহ করার জন্যে বলল। চারজন জংলীকেও দরকার। সর্দার কুয়াশার নির্দেশ পেয়ে ঘোড়া যোগাড় করে দিল। চারজন জংলীকে নিয়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে গেল কুয়াশা তীরবেগে ঘোড়ার পিঠে চড়ে।

রাসেলের সন্ধানে গেল কুয়াশা।

ছয়

আড়াই তিন হাত দূর থেকে সামনের জানোয়ারটা কথা বলে উঠল, 'রাসেল।'

আবার চমকে ওঠায় তাল হারিয়ে ফেলেছিল রাসেল। অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্যে কেইবা আর আগে থেকে তৈরি হয়ে থাকে।

মাথার উপরের ডালটা ছেড়ে দিয়ে রাসেল সামনের একটা ডালে গিয়ে বসল।

নেকড়েটা সেই একই জায়গা থেকে ডাকছে। ভয়ে পিছন ফিরে তাকায়নি রাসেল অনেকক্ষণ। মাত্র চার পাঁচ হাত পিছনে নেকড়েটা আছে বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার ডাক শুনে। কিন্তু কেন যে সে এগিয়ে আসছে না বা ঝাঁপিয়ে পড়ছে না তার উপর তা বুঝতে পারছে না রাসেল।

সামনের বিপদটা কেটে গেছে।

ফোম আবার দু'হাত দূর থেকে নিচু গলায় ডাকল, 'রাসেল। কথা বলছ না কেন? খুব ভয় পেয়েছ বুঝি?'

এগিয়ে আসছে ফোম।

'ফোম, আমার পিছনের ডালে একটা নেকড়ে বসে আছে···।'

চাপা হাসি শোনা গেল। ফোম হাসছে শুনতে পেয়ে বিস্মিত হলো রাসেল।

হাসছে কেন মেয়েটা? নেকড়ের ডাক না শোনার কথা নয় ওর।

মুখোমুখি এসে থামল ফোম। নিচের দিকে তাকাল। বিদ্যুৎবেগে হাত নেড়ে অবিরাম মশার সাথে যুদ্ধ করছে জোনজা। অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে তাকে।

'তোমাকে দেখে ভয় পেয়েছিলাম,' রাসেল বলল, 'আমার পিছনে একটা নেকড়ে অনেকক্ষণ থেকে...'

'ওটা নেকড়ে নয়, রাসেল,' বলল ফোম। 'নেকড়ে কি গাছে চড়ে? ওটা আসলে লিয়র পাখি। দেখতে ময়ূরের মত। বড় পাজি পাখিটা। ভয় পাইয়ে দিয়ে মজা পায় খুব। লিয়র যে কোন জীব জানোয়ারের ডাক হুবহু নকল করতে পারে।'

ফিসফিস করে কথা বলছে ফোম। জোনজা যেন তার কথা শুনতে না পায়।

'জোনজা কি গ্রামে গিয়েছিল?' জানতে চাইল ফোম।

'হ্যাঁ। বহু জংলীকে খুন করে এসেছে ও।'

'এবার নিয়ে চারবার হলো।' চিন্তিতভাবে বলল কথাটা ফোম।

'ডক্টর মূরকোট ওকে মেরে ফেলছেন না কেন? এভাবে যদি মানুষ খুন করতে থাকে...।'

'ও কথা বোলো না, রাসেল।' ফোম দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'জোনজাকে আজ আমিও ভয় পাই। কিন্তু একদিন ও আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিল। সারাটা দিন আমরা একসাথে থাকতাম। আমাকে না নিয়ে কোথাও যেত না জোনজা। আমাকে ছাড়া একদণ্ডও থাকতে পারত না।'

দুষ্টু লিয়র পাখিটা আবার ডেকে উঠল নেকড়ের নকল করে।

ফোম আবার বলল, 'জোনজাকে ধরে বন্দী করা দরকার। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও বাবা তা পারছেন না।'

রাসেল বলল, 'জোনজা আবার স্বাভাবিক এবং সুস্থ হবে বলে তুমি আশা করো?'

'বাবা তো আশা করেন। বাদ দাও ওর কথা।'

ফোম উদাস হয়ে উঠল।

রাসেল প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার খিদে পায়নি?'

'পেয়েছে। তোমার?'

'আমারও। কিন্তু সকাল না হওয়া অবধি পেটে কিছু দেয়ার কথা তো ভাবাই যায় না।'

'যায়।'

ফোম নড়ে উঠল, 'তুমি চুপচাপ বসে থাকো। দেখি আমি কি করতে পারি।'

ফোম ঘুরে দাঁড়াল ডালের উপর।

'কোথায় চললে?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল রাসেল।

'ভয়ের কিছু নেই। এই জঙ্গলে আমি বড় হয়েছি। অচেনা অজানা কিছু নেই

আমার।'

চলে যাচ্ছে ফোম।

দেখতে দেখতে এক ডাল থেকে আর এক ডালে পা দিতে দিতে অদৃশ্য হয়ে গেল সে!

প্রায় আধঘন্টা পর আবার দেখা গেল ফোমকে। ফিরে আসছে সে।

কাছাকাছি এসে ফোম সহাস্যে বলল, 'হাত পাতো তো দেখি, রাসেল।'

দুহাত একত্রিত করে ফোমের সামনে মেলে ধরল রাসেল। ফোম ওর হাতে একরাশ বাদাম দিয়ে বলল, 'এগুলো কিন্তু সাধারণ বাদাম নয়। নিড়ি বলে এগুলোকে এখানে। কি রকম স্বাদ খেয়ে দেখো।'

সত্যি নিড়ির স্বাদ অপূর্ব লাগল রাসেলের।

বাদাম খেতে খেতে রাসেল জিজ্ঞেস করল, 'জোনজার হাত থেকে নিষ্কৃতির উপায় কি বলো তো? গাছ থেকে নামব কিভাবে আমরা?'

'ভেবো না। সে ব্যবস্থাও করে এসেছি। এই নাও, ধরো। এগুলো রেখে দাও পকেটে।'

হাত পাতল রাসেল। ছোট ছোট আমের মত চার পাঁচটা অচেনা ফল দিল ফোম।

'কি এগুলো?'

'বুনো ফল। মুশো বলে এগুলোকে জংলীরা। বিষাক্ত। একটা খেলেই অজ্ঞান হয়ে যাবে যে-কোন লোক। সকাল হলে জোনজার কোলে ফেলব ওপর থেকে। ওরও খিদে লাগবে তখন। দু'একটা যদি খায় তাহলে কাজ হবে।'

'কিন্তু যদি না খায়, বা খেলেও কোন কাজ না হয়?'

'কাজ হবেই। যদি না খায়? না খেলে তখনকার কথা তখন ভাবা যাবে। অকারণে দুশ্চিন্তা না করে এসো গল্প করে রাতটা কাটিয়ে দিই।'

'কি গল্প শুনতে চাও?'

'দাঁড়াও আগে তোমার পাশে গিয়ে বসি।'

ফোম সরে এসে রাসেলের গায়ে গা ঠেকিয়ে পাশে বসল। বলল, 'হ্যাঁ, এবার বলো। তোমার দেশের কথা বলো রাসেল, তোমার নিজের কথা বলো। আমি বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে চাই। বাংলাদেশের মানুষদের সম্পর্কে জানতে চাই। ওখানকার যুবকরা কি সবাই তোমার মত সাহসী আর বুদ্ধিমান?'

গল্প শুরু করল রাসেল। রাত আস্তে আস্তে বাড়ছে। এক সময় রাসেলের গল্প শেষ হলো। এবার ফোমের পালা। ফোম নিজের সম্পর্কে, জংলীদের সম্পর্কে জোনজার সম্পর্কে অনেকক্ষণ গল্প করল। জোনজার সাথে ফোমের সম্পর্ক চিরকালের জন্যে স্থায়ী করার কথা ভেবেছিলেন ফোমের বাবা এবং জংলী সর্দার একথাটাও প্রকাশ করল ফোম। জোনজাকে জীবন সঙ্গী হিসেবে ফোমের পছন্দ ছিল

খুব। তখন জোনজা ছিল জংলীদের মধ্যে সবচেয়ে ভদ্র, শান্ত, বুদ্ধিমান এবং আন্তরিক। কেউ কোনদিন না হেসে কথা বলতে দেখেনি জোনজাকে। একটা পিঁপড়ের উপরও অসীম দয়া ছিল তার। ক্ষমা করা ছিল জোনজার মহৎ একটা গুণ। কারও মনে কখনও সে আঘাত দিত না। জোনজার প্রতি প্রচণ্ড একটা আকর্ষণ ছিল ফোমের।

কথার শেষে ফোম বলল, 'আমি কাউকে কোনদিন এ সম্পর্কে কিছু বলিনি। কিন্তু সবার বিরুদ্ধে আমার অনেক বড় অভিযোগ আছে। বাবা কেন তার পরীক্ষার জন্যে ওকে বেছে নিলেন? জানো, রাসেল, মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয়?'

আস্তে জিজ্ঞেস করল রাসেল, 'কি মনে হয়?'

'মনে হয় বাবাকে আমার ঘৃণা করা উচিত। মনে হয়…।'

'ছিঃ, ফোম। ড. মূরকোট ইচ্ছা করে জোনজার এই ক্ষতি করেননি। একথা তোমার ভোলা উচিত নয়। বিজ্ঞানের সাধক তিনি…।'

'জানি, সব জানি। কিন্তু চোখের সামনে জোনজার হাল দেখে আমার যে কি কষ্ট হয় রাসেল তা কেউ বুঝবে না।'

ফোমের কাঁধে হাত রাখল রাসেল। বলল, 'আর কেউ না বুঝুক, আমি বুঝি ফোম।'

ফুঁপিয়ে উঠে ফোম রাসেলের কাঁধে মাথা রাখল।

সূর্য ওঠার আগেই বনভূমি কাঁপিয়ে তুলল জোনজা রাসেলের সাথে গাছের উপর ফোমকে দেখে।

উপর থেকে জোনজাকে শান্ত করার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। বড় বড় মাটির টুকরো ছুঁড়ে মারতে লাগল সে ওদের দিকে। অবশ্য তাতে কোন ক্ষতি হলো না ওদের।

ফোম চাপা স্বরে রাসেলকে বলল, 'রাসেল, তুমি বাদাম খাও তোমাকে খেতে দেখলে ওরও খিদে পাবে।'

রাসেল বাদাম ছাড়িয়ে মুখে দিতে লাগল।

দমাদম ঘুসি মারছে জোনজা নিজের বুকে। প্রচণ্ড ক্রোধে গর্জে উঠছে সে বিকটস্বরে। বুকের রক্ত ঠাণ্ডা হিম হয়ে যাবার অবস্থা সে গর্জনে।

ফোমের হাতে বিষাক্ত ফলগুলো দিল রাসেল পকেট থেকে বের করে।

একটি একটি করে নিচে ফেলল ফোম সেগুলো। মুহূর্তের জন্যে শান্ত হলো জোনজা। মাটিতে পড়া ফলগুলোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বেশ কয়েক মুহূর্ত। তারপর একপা-দু'পা করে এগিয়ে এসে মাটি থেকে তুলে নিল দুটো ফল। দুটো ফলই একসাথে মুখের ভিতর ফেলল জোনজা।

চাপা স্বরে রাসেল বলে উঠল, 'খাচ্ছে।'

ফোমের শঙ্কিত গলা শোনা গেল, 'জেনেশুনে মারাত্মক কোন ক্ষতি করে ফেললাম না তো? জোনজা যদি মারা যায়…'

ফোমের কথা শেষ হবার আগেই প্রচণ্ড আর্তনাদ করে উঠল জোনজা। দুটো হাত উপর দিকে তুলে দিয়ে দাঁতে দাঁত চাপছে সে। তাকিয়ে আছে সে বিস্ফারিত চোখে উপর দিকে।

জোনজা কাঁপছে।

একমুহূর্ত পরই সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল জোনজা। পড়েই স্থির হয়ে গেল তার প্রকাণ্ড শরীরটা।

নিঃশব্দে নামতে শুরু করল ওরা। আশঙ্কায় কালো হয়ে গেছে ফোমের চোখ মুখ।

নিচে নেমে এসে রাসেল গভীর মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করল জোনজার পালস্।

'না ভয় পেয়ো না, ফোম। জোনজা মরেনি। শুধু জ্ঞান হারিয়েছে।'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি যে হয়…'

জোনজার কাছ থেকে বেশ কয়েক হাত দূরে সরে এসে বসল ওরা পাশাপাশি।

সময় বয়ে চলল। চুপচাপ বসে রইল ওরা জোনজার দিকে তাকিয়ে। কারও মুখে কোন কথা নেই।

গাছের উপর শব্দ হতে মাথা তুলে এক সময় তাকিয়ে গতরাতের লিয়র পাখিটাকে দেখতে পেল রাসেল। ঠিক ময়ূরের মতই দেখতে। ফোম পাখিটা সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলেছে ওকে। লিয়রের লেজের পালক সংখ্যা ষোলোটা। লম্বা পাখিটা দেখতে বড় সুন্দর লাগল রাসেলের। গায়ের পালকের রঙ খয়েরী, লাল লাল ফোঁটা সারা গায়ে। আকারে মাঝারি হাঁসের মত। রাসেলের দিকেই সকৌতুকে তাকিয়ে আছে পাখিটা। লিয়রের বয়স তিন কি চার হলে লেজের পালকগুলো বড় হয়। সঙ্গিনীকে ডাকার সময় পেখম মেলে ধরে সে। লিয়র শিকার করা জংলীদের মধ্যে দণ্ডনীয় অপরাধ। জংলীরা অসভ্য হলেও দুষ্প্রাপ্য পাখিকুলকে বাঁচিয়ে রাখার প্রবণতা আছে জেনে অবাক না হয়ে পারেনি রাসেল। সাধারণত গাছে বা পাহাড়ের চূড়ায় বাসা বানিয়ে বাস করে ওরা।

প্রায় আধঘণ্টা পর আবার একবার পরীক্ষা করল রাসেল জোনজাকে।

মারা যায়নি জোনজা। পালস ঠিকমতই চলছে। তবে জ্ঞান ফেরার কোন লক্ষণ তার মধ্যে নেই। বুনো লতা দিয়ে দুটো দড়ি বানাল রাসেল। একটি গাছের সাথে জোনজার পা দুটো বাঁধল ও একটা দড়ি দিয়ে। বাকি দড়িটা দিয়ে বাঁধল হাত দুটো।

'কতক্ষণ লাগবে গ্রামে ফিরতে আমাদের?' হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল রাসেল।

'ঘণ্টা তিনেক তো বটেই। অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল ফোম।

ফোমের পরনে রাসেলের দেয়া সেই শার্টটা অতিরিক্ত লম্বা বলে রক্ষে। তবু হাঁটু অবধিও ঢাকতে পারেনি সে। ফোমের ফর্সা মাংসল উরুর খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে শার্টটা। জোনজার কাণ্ড। বোতাম ছিঁড়েছে চারটে। বাতাসে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে মাঝখান থেকে মাঝে মাঝেই। লজ্জায় অস্থির হয়ে উঠছে ফোম। রাসেলের চোখে ধরা পড়ে যাবে ভেবে ভীষণ খারাপ লাগছে তার।

দ্রুত হাঁটছিল রাসেল।

ঘণ্টা দুয়েক পর হঠাৎ পিছন থেকে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ফোম রাসেলের উপর। রাসেলের একটা হাত ধরে বাঁ দিকে ছুটতে শুরু করল সে।

'কি হলো ফোম?'

একটা ঝোপের ভিতর রাসেলকে নিয়ে এল ফোম। হাঁপাতে হাঁপাতে ও বলল, 'কথা বোলো না। বসে পড়ো। শুনতে পাচ্ছ না ঘোড়া ছুটিয়ে কারা যেন আসছে?'

কান পাতল রাসেল। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছে সে। কারা যেন এদিকেই আসছে ঘোড়া ছুটিয়ে।

চাপাস্বরে রাসেল জিজ্ঞেস করল, 'এতে ভয় পাবার কি আছে? গ্রামের জংলীরা হয়তো আমাদেরকে খুঁজতে এদিকে আসছে।'

'হয়তো। কিন্তু জংলীরা সাধারণত ঘোড়ায় চড়ে না। যারা আসছে তারা জংলী না-ও হতে পারে।'

'তারা ছাড়া আর কে আসবে এ জঙ্গলে? ডেভিডের লোক?'

'না। হাহারা হতে পারে। তারা ঘোড়া ছাড়া আধ গজও যায় না।'

'হাহা? ওরা আবার কারা?'

'গ্রেট ভিক্টোরিয়া মরুভূমিতে থাকে হাহারা। ভয়ঙ্কর লোক ওরা। তাজা মানুষ ধরে ধরে খায়। ওদের সম্পর্কে তোমাকে অন্য সময় বলব।'

হঠাৎ সামনের গাছ পালার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল কুয়াশাকে। কুয়াশার পিছনে একদল জংলী।

ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ওরা দু'জন হাসতে হাসতে। লাগাম টেনে ধরে ছুটন্ত ঘোড়াকে তখুনি দাঁড় করাল কুয়াশা। ঘামে চিক চিক করছে তার কপাল। লাল টকটকে আলখাল্লা পরে সাদা একটা প্রকাণ্ডদেহী ঘোড়ার উপর বসে আছে সে। মুগ্ধ হলো রাসেল। বড় সুন্দর মানিয়েছে কুয়াশাকে গহীন এই অরণ্যে।

রাসেল এবং ফোমের দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে রইল কুয়াশা খানিকক্ষণ। মিটিমিটি হাসি তার ঠোঁটে।

'বিরক্ত করলাম নাকি হে তোমাদেরকে?'

সহাস্যে জিজ্ঞেস করল কুয়াশা, 'বেড়াচ্ছ বুঝি?'

হেসে ফেলল রাসেল।

ফোম কুয়াশার রসিকতার অর্থ অনুধাবন করতে পেরে লজ্জা পেল। মাথা নামিয়ে নিল ও। কিন্তু পরমুহূর্তে ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকাল। বলল, 'জানেন, খুব বাঁচা বেঁচে গেছি আমরা।'

রাসেল বলল, 'জোনজাকে বিষাক্ত বুনো ফল খাইয়ে আমরা অজ্ঞান করে বেঁধে রেখে এসেছি মাইল তিনেক পিছনে।'

কুয়াশা বলল, 'গুড। কিন্তু তোমার ওই বাঁধায় কি কাজ হবে? কিসের সাথে বেঁধেছ?'

'গাছের সাথে। জ্ঞান ফিরতে দেরি আছে এখনও ওর।'

'জায়গাটা ঠিক কোথায় বলতে পারো?'

ফোম বলল, 'আপনি ঠিক চিনবেন না, ড. কুয়াশা। তবে জংলীদেরকে বলে দিলে ওরা চিনবে। ওদেরকে বলে দিচ্ছি। আপনারা সময় মত গিয়ে পৌঁছুতে পারলে ঘোড়ার পিঠের সাথে বেঁধে ওকে গ্রামে আনার একটা উপায় হয়। গ্রামে একবার ধরে আনতে পারলে আর কোন সমস্যা থাকে না।'

জংলীদেরকে পথের নির্দেশ জানিয়ে দিল ফোম।

কুয়াশা বলল, 'বোধহয় সারারাত ঘুমাওনি?'

'না, মানে…।'

'থাক, থাক। বুঝতে পারছি সব। ঠিক আছে, তোমাদেরকে আর বিরক্ত করব না। যাও তোমরা। গ্রামে গিয়ে ঘুমিয়ে পোড়ো কিন্তু। তা না হলে শরীর খারাপ করবে। সামনে অনেক কাজ।'

মৃদু হাসি কুয়াশার ঠোঁটে। বিদায় নিল সে ওদের কাছ থেকে। ঘোড়া ছুটিয়ে জংলী চারজনকে নিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়াশা।

রাসেল এবং ফোম হাঁটতে শুরু করল আবার।

সাত

ঘন্টা দুয়েক পর গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়ল ওরা।

ফোম কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ ও তাকাল রাসেলের দিকে।

কান পেতে আছে রাসেলও। অদূরেই গ্রাম। গ্রামের দিক থেকে শোরগোলের শব্দ আসছে।

দ্রুত পা বাড়াল ওরা। শোরগোলের শব্দ ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। ছুটল ফোম। রাসেলও দেখাদেখি দৌড়াতে শুরু করল।

মিনিট খানেক পর একদল জংলীর দেখা পেল ওরা। পড়িমরি করে ছুটে আসছে

জংলীরা ঝোপ ঝাড় টপকে।

ফোম চিৎকার করে থামতে বলল জংলীদেরকে। কিন্তু তারা থামল না। ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে লোকগুলোর মুখ। আতঙ্কিত স্বরে বিড় বিড় করে তারা বলছে, 'হাহা…হাহা…হাহা…।'

ফোম থমকে দাঁড়াল।

'কি হলো?'

'গ্রামে হাহারা হামলা চালিয়েছে! দিনের বেলায় তো কখনও হামলা চালায় না ওরা। এ নিশ্চয়ই ডেভিডের কাজ। ডেভিড লেলিয়ে দিয়েছে ওদেরকে।'

রাসেল দেখল গ্রামের দিক থেকে জংলীরা প্রাণভয়ে ছুটে পালিয়ে আসছে।

'চলো, দেখি…।'

'না!'

রাসেলের একটা হাত ধরে ফেলল ফোম। বলল, 'যেতে পারবে না তুমি। একবার ওদের হাতে ধরা পড়লে কেউ ফিরে আসতে পারে না।'

রাসেল ফোমের চোখে চোখ রেখে হাসল। বলল, 'সকলের সম্পর্কে সে কথা প্রযোজ্য নয়, ফোম। আমি ধরাই পড়ব না।'

ফোমের হাত থেকে নিজের হাতটা এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটল রাসেল।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ফোম, 'রাসেল, যেয়ো না! রাসেল, শোনো! রাসেল, কথা শোনো…!'

ছুটল ফোম রাসেলের পিছু পিছু।

জংলীরা রাসেল এবং ফোমকে গ্রামের দিকে ছুটতে দেখেও ভ্রূক্ষেপ করল না। তারা প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত।

এক প্রান্ত দিয়ে গ্রামে ঢুকল রাসেল।

গ্রামের অপর প্রান্তে দেখা গেল পনেরো বিশ জন ঘোড়সওয়ারকে। রোদে চকচক করছে লাল ঘোড়াগুলোর শরীর। চকচক করছে ঘোড়সওয়ারদের নিখুঁত ভাবে কামানো ন্যাড়া মাথা। ঘোড়সওয়ারদের পরনে পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি করা উরুর অর্ধেক অবধি ঢাকা পোশাক। ঊর্ধ্বাঙ্গে পরেনি কিছু তারা। পেশী বহুল তামাটে গায়ের ত্বক ঘামে পিচ্ছিল। তাগড়া ঘোড়ার পিঠে শক্তভাবে বসে আছে হাহারা। হাহাদের স্বাস্থ্য দর্শনীয় বস্তু। ভরাট মুখ, বড় বড় নাক, ছোট ছোট চোখ। প্রতিটি হাহার চেহারায় ফুটে আছে হিংস্র খুনীর নির্মমতা। হাহাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে বর্শা।

রোমকে ঘোড়ার উপর তুলে নিয়েছে একজন হাহা। গ্রাম ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত তারা।

উঠানের এক ধারে পড়ে রয়েছেন ড. মূরকোট। তার কোমরে বিঁধেছে একটা বর্শা। একটু একটু নড়ছেন তিনি। উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। বেঁচে আছেন এখনও।

রাসেল মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল। ড. মূরকোটের দিকে প্রাণপণে ছুটল ও।

ড. মূরকোটের কাছে এসে বসে পড়ল রাসেল। ড. মূরকোটের শরীরের নিচে চাপা পড়ে রয়েছে একটা রাইফেল। নলটা দূর থেকে দেখেই ছুটে এসেছে রাসেল।

হাহারা পালিয়ে যাচ্ছে। রোমকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে তারা। চিৎকার করছে রোম সাহায্যের জন্যে।

ড. মূরকোটের শরীরের নিচ থেকে হেঁচকা টান দিয়ে রাইফেলটা বের করে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল রাসেল।

একটা বর্শা এসে পড়ল মাথার কাছ থেকে আধ হাত সামনে।

শুয়ে শুয়ে রাইফেলের ট্রিগারে টান দিল রাসেল। চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে গুলির শব্দ হলো।

'হা-আ-আ-আ-আ-হা!'

হাহারা অদ্ভুত কণ্ঠে অবিরাম চিৎকার করছে। সবচেয়ে পিছনের ঘোড়সওয়ারটির মেরুদণ্ডে গিয়ে বিদ্ধ হলো বুলেট।

বাঁকা হয়ে গেল হাহার পিঠ। আকাশের দিকে মুখ তুলে মৃত্যু-যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল সে। দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ তার ঘোড়া। হাহার দেহটা পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে।

রাইফেল হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রাসেল। হাহাদের দলটা অদৃশ্য হয়ে গেছে জঙ্গলের আড়ালে।

'রাসেল!'

পিছন থেকে ব্যাকুল গলায় ডাকল ফোম। সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে ঘোড়াটার দিকে ছুটল রাসেল। হাত চারেক দূর থেকে লাফ দিল ও। প্রায় উড়ে গিয়ে দু'পা দু'দিকে মেলে দিয়ে, ঘোড়ার পিঠে গিয়ে নামল রাসেল।

লাগাম ধরে টান দিতেই পা বাড়াল ঘোড়া।

পিছন থেকে ফোমের কান্নাজড়িত কণ্ঠ ভেসে আসছে, 'রাসেল, ফেরো, রাসেল, ফিরে এসো···!'

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছুটছে। ছুটছে না বলে হাঁটছে বলাই ভাল। নানা রকম বাধা সামনে। এঁকেবেঁকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। ইচ্ছা থাকলেও ছুটতে পারছে না ঘোড়া।

হাহাদের ঘোড়াগুলোরও সেই একই অবস্থা। রাসেল হাহাদেরকে দেখতে না পেলেও শব্দ শুনে বুঝতে পারছে শত্রুরা সামনেই আছে।

ঘোড়াটা হাহাদেরই। পথ ভুল হবার উপায় নেই। সামনের ঘোড়াগুলোকে ঠিকই অনুসরণ করে যাবে রাসেলের ঘোড়া।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর জঙ্গল ক্রমশ হালকা হয়ে আসতে লাগল।

গতি বাড়ল ঘোড়ার।

আরও মিনিট পনেরো পর জঙ্গলের শেষ সীমায় এসে পৌঁছুল রাসেল ঘোড়ার পিঠে চড়ে।

জঙ্গলের যেখানে শেষ, মরুভূমির সেখানে শুরু। দিগন্তরেখা অবধি বিস্তৃত প্রকাণ্ড বিশাল সীমাহীন ধু-ধু মরুভূমি।

মাথার উপর জ্বলন্ত সূর্য।

রাসেলের ঘোড়া তীর বেগে ছুটে চলেছে।

সামনের দিকে, যতদূর দৃষ্টি যায়, মরুভূমি এবং মরুভূমির শেষ সীমায় আকাশ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। এই সেই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক গ্রেট ভিক্টোরিয়া ডেজার্ট। এই মরুভূমিতে পৃথিবীর সবচেয়ে আদিম বাসিন্দারা এখনও বাস করে। এই মরুভূমিতে পথ হারিয়ে কত শত লোক প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

হাতের বাঁ দিকে এবং ডান দিকে, প্রায় মাইল খানেক দূরে, উঁচু পাহাড় শ্রেণী। এই পাহাড়েই বাস করে হাহারা।

কিন্তু পাহাড়ের দিকে মুখ করে ছুটছে না হাহারা। সোজা ছুটে চলেছে পনেরো বিশজন খুনী নরমাংসভোজী হাহা।

হাহাদের অনেক পিছনে পড়ে গেছে রাসেল।

ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে হাহাদের তাগড়া ঘোড়াগুলো।

রাসেলের ঘোড়াটাও কারও চেয়ে কম নয়। একহাতে লাগাম ধরে রেখেছে রাসেল। পা দিয়ে খোঁচা মারছে ও ঘোড়ার পাঁজরে। ওর ডান হাতে ধরা রাইফেল।

খোঁচা খেয়ে আরও জোরে ছুটতে শুরু করল ঘোড়া।

মাথার উপর জ্বলন্ত সূর্য। ঘামে সর্বশরীর ভিজে গেছে। সাদা স্যাণ্ডো গেঞ্জি রাসেলের গায়ে। ওর চুলগুলো বাতাসে উড়ছে।

রাইফেলের শব্দ হলো।

লক্ষ ব্যর্থ হলো রাসেলের।

দূরত্ব কমেছে অনেকটা এতক্ষণে।

বড় জোর পঞ্চাশগজ পিছনে এখন রাসেল হাহাদের কাছ থেকে।

সোজা ছুটছে হাহাদের ঘোড়া।

হাহাদের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ডান এবং বাঁয়ের পাহাড় শ্রেণীর পাদদেশের দিকে ওর দৃষ্টি পড়ল।

স্তম্ভিত হলো রাসেল।

মাইলের পর মাইল ব্যাপী পাহাড়শ্রেণী। পাহাড়ের পাদদেশে সার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে হাহারা।

হাহাদের সংখ্যা যে এত বেশি তা কল্পনা করেনি আগে রাসেল।

সম্মুখবর্তী ঘোড়সওয়ারদের দিকে তাকাল রাসেল। সন্দিহান হয়ে উঠল ও। হাহাদের ঘোড়া সোজা ছুটে চলেছে। একটি ঘোড়া তাদের সাথে যাচ্ছে না। সে ঘোড়াটা বাঁ দিকের পাহাড়শ্রেণীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটছে। ঘোড়ার সওয়ার একা নয় পিঠে। তার সামনে হাত পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে রোম।

ঘোড়াটা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকের পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশে অপেক্ষারত হাহারা নেই। আরও খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে হাহাদের ঘোড়াগুলো।

ওদিকে যাবার কারণ কি?

ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড় করাল রাসেল। দ্রুত রহস্যটার সমাধান পেতে চাইল ও।

ঘোড়াটা একা যেদিকে ছুটছে সেদিকে পাহাড় শ্রেণীর মাঝখান দিয়ে একটা গিরিপথ দেখা যাচ্ছে। এই গিরিপথ দিয়ে পালিয়ে যেতে চায় ঘোড়ার পিঠের হাহা। তাই সে দল ছাড়া হচ্ছে।

গিরিপথ, হাহার ঘোড়াটা এবং রাসেল–তিনটে বিন্দু একটি ত্রিভুজের সৃষ্টি করেছে। ঘোড়াটিকে অনুসরণ করা হবে সময়ের অপচয়। রাসেল হিসেব করে পরিষ্কার বুঝতে পারল গিরিপথ লক্ষ করে ছুটলে হয়তো রোমকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে। হাহার ঘোড়াটিও গিরিপথের দিকে যাচ্ছে। রাসেল যদি সরাসরি গিরিপথের দিকে ঘোড়া ছোটায় তাহলে হাহার ঘোড়ার চেয়ে আগে গিরিপথের মুখে পৌছতে পারবে ও।

তীরবেগে গিরিপথের দিকে ছুটল লাল ঘোড়াটা টগবগিয়ে।

পাঁচ মিনিট পরই আশায় আনন্দে ভরে উঠল রাসেলের বুক।

গিরিপথের কাছাকাছি চলে এসেছে সে। হাহার ঘোড়াটাও কাছাকাছি চলে এসেছে। তবে তার ঘোড়াটা রাসেলের ঘোড়ার চেয়েও দ্রুত।

বড় জোড় পঁচিশ গজ সামনে থেকে গিরিপথে ঢুকবে হাহার ঘোড়া। কিন্তু গিরিপথে ঢোকার সুযোগ হাহাটিকে দিতে রাজি নয় রাসেল।

পঁচিশ-ত্রিশ গজ পিছন থেকে রাইফেলের ট্রিগার টানল রাসেল।

গুলির শব্দের সাথে সাথে ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে গেল হাহাটা।

পড়ে গেল রাসেলের ঘোড়াও অপ্রত্যাশিত ভাবে।

ঘোড়াটা বালির উপর পড়ে ছটফট করছে। বালির উপর ঘোড়ার পাশেই পড়েছে রাসেল। উঠে বসার চেষ্টা করল ও।

মাথাটা ঘুরে গেল রাসেলের। ইলেকট্রিক শক খেল যেন ও ব্রেনে। ঘোড়াটা উঠে দাঁড়াবার জন্যে চেষ্টা করছে। পারছে না।

দ্রুত বালির নিচে ডুবে যাচ্ছে প্রকাণ্ড ঘোড়াটা। দ্রুত নড়াচড়া করছে বলে প্রতি মুহূর্তে ইঞ্চি খানেক করে ডুবে যাচ্ছে অবোধ জানোয়ারটা। চিঁ-হিঁ চিঁ-হিঁ করে করুণ কণ্ঠে সাহায্য চাইছে সে। তাকিয়ে আছে জলভরা চোখে রাসেলের দিকে।

আমি নিরুপায়! মনে মনে ঘোড়াটার উদ্দেশে বলল রাসেল। এতটুকু নড়ল না ও। ঘোড়াটার চোখের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সামনের দিকে তাকাল রাসেল।

হাহার ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে রোমের দিকে তাকিয়ে। রোম বালিতে উঠে বসে খোলার চেষ্টা করছে পায়ের বাঁধন। হাতের বাঁধন খুলে ফেলেছে সে। হাহাটা পড়ে আছে মুখ থুবড়ে উত্তপ্ত বালিতে। নড়ছে না। মাথার পিছনে লেগেছে বুলেট। বেঁচে নেই।

নিজের ঘোড়াটার দিকে তাকাল রাসেল ঘাড় ফিরিয়ে।

নেই ঘোড়াটা!

চোরাবালি গ্রাস করেছে প্রকাণ্ড ঘোড়াটাকে।

এতটুকু নড়ছে না রাসেল। কিন্তু তাতেও বাঁচার কোন আশা নেই পরিষ্কার বুঝতে পারছে। নড়াচড়া না করলেও একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে তার শরীর। ক্রমশ বালি ওকে গ্রাস করছে।

চোখ তুলল রাসেল।

হাহাদেরকে ফিরে আসতে দেখে নতুন করে ভয় পেল না ও। মৃত্যু তো অনিবার্য। চোরাবালিতেই হোক আর হাহাদের বর্শার আঘাতেই হোক।

রোম পায়ের বাঁধন খুলতে পারছে না। সেদিকে তাকিয়ে মনটা কেঁদে উঠল রাসেলের। পায়ের বাঁধন খুলতে ব্যস্ত সে। জানতেও পারছে না হাহারা ফিরে আসছে তাকে ধরার জন্যে। রোমকে বাঁচাতে পারলে মরেও শান্তি পেত সে। কিন্তু তা হবার নয়।

ঘোড়সওয়ার হাহাদের দিকে তাকাল রাসেল ধীরে ধীরে। এখনও অনেক দূরে ওরা। অর্ধেকের বেশি ডুবে গেছে রাসেল ইতিমধ্যে। ওরা এসে পৌঁছুবার আগেই ডুবে যাবে সে।

বড় বিপজ্জনক এই চোরাবালি। এ ধরনের চোরাবালি গ্রেট ভিক্টোরিয়া মরুভূমিতেই বেশি দেখা যায়। হাহাদের বুদ্ধি আছে, মনে মনে স্বীকার করল রাসেল। চোরাবালির ফাঁদে তাকে ফেলার জন্যেই দিক পরিবর্তন করেছিল হাহাটা।

বুকের আর সামান্য বাকি আছে ডুবতে। এবার কষ্ট সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। দম নিতে পারছে না রাসেল। আকাশের দিকে তাকাল ও।

চোখ নামাল ও রোমের কান্না শুনে। চিৎকার করে কাঁদছে রোম। এদিকে পায়ের বাঁধন খুলতে পারছে না সে।

বালির নিচে ডুবতে আর বড় জোর একমিনিট দেরি রাসেলের। শহীদের কথা মনে পড়ল ওর। তার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শহীদ ভাই চমকে উঠবেন নিশ্চয়ই। ভীষণ আঘাত পাবেন মনে। তাকে তিনি ভালবাসেন। আঘাত পাবে আরও একজন। সে হলো কুয়াশা। বড় মায়া লোকটার মনে। মহৎ পুরুষ।

রোম খবরটা শুনে কাঁদবে। কষ্ট হচ্ছে রাসেলের। একটু হাসি ফুটল তবু ঠোঁটে।

গলা পর্যন্ত ডুবে গেছে। আস্তে আস্তে চিবুক, ঠোঁট, নাক এবং চোখ ডুবে যাচ্ছে।

কপালটা দেখা গেল খানিকক্ষণ। তারপর সেটাও গেল। বালি গ্রাস করছে তাজা প্রাণবান ছেলেটাকে।

রাসেলের মাথাটাও দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল বালির নিচে।

হঠাৎ আনন্দে চিৎকার করে উঠল রোম। কিন্তু সে আনন্দ ধ্বনি শোনার জন্যে পৃথিবীর উপর নেই রাসেল তখন।